লক্ষ্ণৌ চুক্তি থেকে ভারত বিভাগ (১৯১৬-১৯৪৭ খ্রি.)

ইউনিট ১০

ভূমিকা

বিশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতের রাজনীতিতে বেশকিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও সহযোগিতা প্রদানের পাশাপাশি ভারতীয়দের মধ্যে স্বার্থ আদায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠার চেতনা জাগে। বঙ্গভঙ্গ রদের পরে মুসলমানরা ইংরেজদের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। তারা হিন্দুদের সঙ্গে সহযোগিতার পথে পা বাড়ায় এবং স্বরাজ অর্জনকে তাদের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করে। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রশ্নে এক যৌথ দাবিনামায় চুক্তিবদ্ধ হয়। মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারে সে দাবির কিছু প্রতিফলন থাকলেও ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ প্রতিফলন তাতে ছিল না। বাংলার নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস হিন্দু মুসলিম ঐক্যের জন্য 'বেঙ্গল প্যাক্ট চুক্তি' করলেও এটা ক্ষণস্থায়ী হয়। পুনরায় ভারতের রাজনীতিতে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে ঘটে বিভেদের সূত্রপাত। শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বৃটিশ সরকার সাইমন কমিশন গঠন, গোল টেবিল বৈঠক আহবান ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ভারতীয়দের উদ্যোগে নেহেরু রিপোর্ট, জিন্নাহ্‌র চৌদ্দ দফা ইত্যাদিও সমস্যার সুরাহা করতে পারে নি। পরে আসে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে উপমহাদেশের মুসলমানরা নিজেদের জন্য একাধিক স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। ভারতের রাজনীতি সুস্পষ্টভাবে অনৈক্যের পথে ধাবিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে বৃটিশ সরকার একটি শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে উপমহাদেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য নানা উপায়ে চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো চেষ্টাই ফলপ্রসূ হয় নি। হিন্দু মুসলিম অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটলে শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়। অভ্যুদয় ঘটে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি রাষ্ট্রের।

এ ইউনিট পাঠ করে আপনি ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ পরবর্তী ভারতের হিন্দু মুসলিম রাজনৈতিক ধারা সম্পর্কে জানবেন; ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংকট সমাধানের চেষ্টা সম্পর্কে অবহিত হবেন এবং ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভক্তির পটভূমি আলোচনা করতে সক্ষম হবেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-১০.১ লক্ষ্ণৌচুক্তি (১৯১৬ খ্রি.)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- লক্ষ্ণৌচুক্তির পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- চুক্তির বিষয়বস্তু কী ছিল তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- লক্ষ্ণৌচুক্তির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	লক্ষ্ণৌচুক্তি, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, সংখ্যালঘু, প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন বা মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন ভারতবাসীর সব দাবি-দাওয়া পূরণে যথেষ্ট সহায়ক হয় নি। এ আইনে যদিও প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি স্বীকার করে নেয়া হয় এবং মুসলমানদের স্বতন্ত্র

নির্বাচনের অধিকার প্রদান করা হয় তথাপি এতে মুসলিম সম্প্রদায় পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হতে পারে নি। এ সময় কয়েকটি ঘটনা মুসলমানদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা তাদেরকে বৃটিশ সরকারের প্রতি সন্দিহান করে তোলে। এ রকম আরও একটি ঘটনা হচ্ছে বলকান যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলিম দেশ তুরস্কের প্রতি বৃটেনের বিরুদ্ধাচারণকে ভারতের মুসলমানরা সমালোচনার চোখে দেখে এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। তাছাড়া ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে কানপুর মসজিদের ঘটনায় পুলিশের গুলিতে কয়েকজন মুসলমান নিহত হলে মুসলমানদের মধ্যে সরকার বিরোধী মনোভাব তীব্র হয়ে উঠে।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ ও অসন্তোষ ভারতের মুসলমানদের রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলে। অভিজাত, রক্ষণশীল ও বৃটিশ অনুগত নেতাদের বদলে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম লীগের তরুন সদস্যগণ দলের মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠে। এ সময়েই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, (যিনি একজন কট্টর কংগ্রেসী ছিলেন) মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চে মুসলিম লীগের লক্ষ্নৌ অধিবেশনে দলের নতুন গঠনতন্ত্র প্রণীত হয়। এতে বলা হয় যে, জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং স্বরাজ অর্জনই হচ্ছে লীগের অন্যতম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এর ফলে ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। অতঃপর লীগ ও কংগ্রেস প্রায় একই সময়ে ও স্থানে এদের বার্ষিক অধিবেশন আহবান করে। এক দলের প্রতিনিধিগণ আরেক দলের অধিবেশনে যোগদান করে। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে বোম্বে শহরে অনুষ্ঠিত উভয় দলের সম্মেলনেই সরকারী নীতির সমালোচনা করা হয় এবং হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্যের উপর জোর দেয়া হয়।

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ এদের বার্ষিক সম্মেলন লক্ষ্নৌ শহরে অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ সময়ে উভয় সম্প্রদায় ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের নীতির প্রশ্নে একটা সমঝোতায় আসে। এটাই ইতিহাসে লক্ষ্নৌ চুক্তি নামে পরিচিত। এ চুক্তির মাধ্যমে কংগ্রেস ও লীগ মিলিত দাবি পেশ করে। চুক্তির বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

লক্ষ্নৌ চুক্তির বৈশিষ্ট্য

১. লক্ষ্নৌ চুক্তিতে কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যসংখ্যা ১৫০ জন করার সুপারিশ করা হয়। এদের মধ্যে পাঁচ ভাগের চার ভাগ হবেন নির্বাচিত সদস্য এবং বাকী একভাগ মনোনীত সদস্য। যতদূর সম্ভব ব্যাপক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন। নির্বাচিত সদস্যের এক তৃতীয়াংশ হবে মুসলিম সদস্য এবং নিজ সম্প্রদায়ের দ্বারাই তারা নির্বাচিত হবেন। কেন্দ্রের হাতে থাকবে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, শুল্ক, রেলওয়ে, ডাক ও তার বিভাগ। ভারত সচিবের কাউন্সিল বিলুপ্ত করতে হবে এবং বৃটিশ সরকারই তাঁকে বেতন দেবে। তাঁর সাহায্যকারী থাকবেন দু'জন এবং এদের মধ্যে একজন হবেন ভারতীয়।

২. প্রাদেশিক আইনসভার ক্ষেত্রে দাবি করা হয় যে, বৃহৎ প্রদেশে সদস্য সংখ্যা ১২৫ জনের কম হবে না। ছোট প্রদেশগুলোতে এ সংখ্যা হবে ৫০ থেকে ৭৫ এর মধ্যে। প্রদেশের ক্ষেত্রেও চার পঞ্চমাংশ সদস্য হবেন নির্বাচিত এবং অবশিষ্ট এক পঞ্চমাংশ মনোনীত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হবে। প্রদেশগুলোতে নির্বাচিত সদস্য সংখ্যার ক্ষেত্রে মুসলিম সদস্য থাকবে পাঞ্জাবে ৫০%, যুক্তপ্রদেশে ৩০%, মধ্যপ্রদেশে ১৫%, বাংলায় ৪০%, বিহারে ২৫%, মাদ্রাজে ১৫% ও বোম্বেতে ৩৩%। এখানেও পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমেই মুসলিম প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবে। তবে শর্ত ছিল যে, এসব সংরক্ষিত আসন ছাড়া মুসলমানরা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক অন্যকোন আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না।

৩. লক্ষ্নৌ চুক্তিতে সিদ্ধান্ত হয় যে, কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক আইন পরিষদে উপস্থিত কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন বিল কখনো গৃহীত হবে না যদি উক্ত সম্প্রদায়ের তিন চতুর্থাংশ সদস্য সে বিলের বিরোধিতা করে।

৪. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একত্রে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

৫. চুক্তিতে দাবি করা হয় যে, ডোমিনিয়ন সরকারসমূহের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের উপনিবেশ মন্ত্রীর যে সম্পর্ক, ভারত সরকারের সাথে ভারত সচিবের সম্পর্কও হতে হবে অনুরূপ।

উপমহাদেশে ইংরেজ রাজত্বকালের ইতিহাসে লক্ষ্নৌচুক্তিই হচ্ছে প্রথম হিন্দু-মুসলিম রাজনৈতিক সমঝোতার স্বাক্ষর। ভারতের জন্য একটি সংবিধানের মূল রূপরেখা প্রণয়নে এটা ছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যৌথ প্রয়াস। এ চুক্তি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সহযোগিতার ভিত্তি রচনা করে। এর দ্বারা উভয় সম্প্রদায় সরকারের নিকট যুক্তভাবে

নিজেদের দাবিনামা পেশ করার সুযোগ পায়। লক্ষ্ণৌচুক্তিতে কংগ্রেস প্রথমবারের মতো মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের অধিকার স্বীকার করে। মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন বলেও মেনে নেয়। তবে এ চুক্তির কিছু সমালোচনা হয়েছে। বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলমানদের সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। শুধু হিন্দু মুসলিম সমঝোতার খাতিরে তাদেরকে এ দুই প্রদেশে জনসংখ্যা অনুপাতে কম সংখ্যক নির্দিষ্ট আসন মেনে নিতে হয়েছে। বাংলার নেতা নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী এ চুক্তির প্রতিবাদে বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ান এবং সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনে যোগদান করেন। অন্যদিকে এ চুক্তির ফলে পাঞ্জাবে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ বিভক্ত হয়ে পড়ে। মাদ্রাজে তামিল ভাষী মুসলমানরা চুক্তির বিরোধিতা করে। তথাপি এটা অনস্বীকার্য যে, ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের লক্ষ্ণৌচুক্তি ঔপনিবেশিক ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ লক্ষ্মৌ চুক্তি সম্পর্কে একটি রচনা লিখুন।

সারাংশ

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সম্পাদিত লক্ষ্ণৌচুক্তি হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক সহযোগিতা ও সামাজিক সম্প্রীতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। ইংরেজদের উপর আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে সহযোগিতার পথে পা বাড়ায় এবং ভারতের জন্য স্বরাজ অর্জনের লক্ষ্যপথ স্থির করে। লক্ষ্ণৌচুক্তির মাধ্যমে এ দুই সম্প্রদায় বৃটিশ সরকারের কাছে যুক্ত দাবিনামা পেশ করে। এ চুক্তিতে কংগ্রেস প্রথমবারের মতো মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবিকে স্বীকার করে নেয় এবং ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানে যৌথ প্রয়াস গ্রহণ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ১৯১৩ খ্রিস্টাবেদ মুসলিম লীগের প্রণীত নতুন গঠনতন্ত্রে কী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা হয়?

i. স্বরাজ অর্জন
ii. জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা
iii. সাম্প্রদায়িক সৌহার্য প্রতিষ্ঠা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। কত খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?

ক) ১৯১১ খ) ১৯১৩
গ) ১৯১৬ ঘ) ১৯২০

৩। লক্ষ্ণৌচুক্তিতে কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য সংখ্যা কতজন করার সুপারিশ করা হয়?

ক) ৫০ খ) ৭৫
গ) ১২৫ ঘ) ১৫০

সৃজনশীল প্রশ্ন

একটি অঞ্চলের দুটি পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক দল জাতির বৃহত্তর স্বার্থে একই মঞ্চে চলে আসে। এ সময় তারা ঐক্যমতের ভিত্তিতে একটি সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এ অবস্থায় উভয় দল পরস্পরকে প্রথমবারের মতো স্বীকৃতি দেয়। এ চুক্তির মাধ্যমে একটি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র নির্বাচনী সুবিধা প্রদান করা হয়। এটিই উক্ত অঞ্চলের ইতিহাসে দুটি দলের প্রথম ঐক্যমতের পদক্ষেপ। ইতিহাস কী এ চুক্তির গুরুত্ব ব্যাপক।

ক. লক্ষ্ণৌচুক্তি কী? ১
খ. লক্ষ্ণৌচুক্তির পটভূমি কী ছিল? ২

গ. উক্ত সমঝোতা চুক্তিটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন। ৩
ঘ. ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল বলে আপনি মনে করেন? ৪

পাঠ-১০.২ খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভারতে খিলাফত আন্দোলন কেন হয়েছিল, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- অসহযোগ আন্দোলন কেন শুরু হয়, সে সম্পর্কেও বিবরণ দিতে পারবেন।
- খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারবেন।
- আন্দোলন দু'টি কেন ব্যর্থ হয়, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	খিলাফত, অসহযোগ, গান্ধী, মাওলানা মোহাম্মদ আলী

ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন দু'টি ছিল প্রথম ব্যাপক ও জাতীয় ভিত্তিক গণআন্দোলন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় মধ্য দিয়ে গড়ে উঠা এ আন্দোলন বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভীতকে কাঁপিয়ে তোলে। এ দুটি আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সফল না হলেও ভারতীয় জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের প্রতীক তুরস্কের খলিফার প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের আনুগত্য ও সম্মানবোধ অনেক দিন থেকেই ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক বৃটিশের নেতৃত্বে গঠিত মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে এবং জার্মানির পক্ষে অবতীর্ণ হওয়ায় ভারতীয় মুসলমানদের মনে দ্বৈত আনুগত্যের প্রশ্ন দেখা দেয়। মহাযুদ্ধের সময় ভারতের মুসলমানগণ বৃটিশ সরকারকে এ শর্তে সমর্থন দেয় যে বৃটিশ সরকার যুদ্ধ শেষে তুরস্কের খলিফার কোনো ক্ষতি করবে না। কিন্তু যুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের পর বৃটিশরা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। মিত্রপক্ষ 'প্যারিস চুক্তির' মাধ্যমে তুর্কী সাম্রাজ্যের ব্যবচ্ছেদ এবং খলিফাকে অর্মযাদা করা হয়। ফলে বিক্ষুব্ধ ভারতীয় মুসলমানরা খলিফার মর্যাদা ও তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার উদ্দেশ্যে এক আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলন ইতিহাসে 'খিলাফত আন্দোলন' নামে পরিচিত। মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ নেতাদের নেতৃত্বে এ আন্দোলন পরিচালিত হয়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে মিত্রপক্ষ তুরস্কের উপর 'সেভার্স চুক্তি' চাপিয়ে দিয়ে তুরস্ক সাম্রাজ্যকে চূড়ান্তভাবে খণ্ড বিখণ্ড করার এবং তুরস্কের সার্বভৌমত্ব বিলুপ্তির উদ্যোগ নিলে খিলাফত আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে লক্ষ্ণৌতে ভারতীয় মুসলমানদের একটি বৈঠকে সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটি গঠিত হয়। বোম্বেকে কেন্দ্র করে সব প্রদেশে কমিটির শাখা প্রশাখা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়। পরের মাসে এ. কে ফজলুল হকের সভাপতিত্বে দিল্লীতে খিলাফত কমিটির প্রথম সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে, বৃটিশ সরকার তুরস্কের খলিফার মর্যাদা রক্ষার কোনো প্রতিশ্রুতি না দিলে মুসলমানরা সরকারের সঙ্গে অসহযোগ নীতি অনুসরণ করবে। প্রয়োজনে তারা বৃটিশ পণ্যও বর্জন করবে। মহাত্মা গান্ধী যিনি এ সময় বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ার লক্ষ্যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন তিনি কয়েকজন কংগ্রেস নেতাসহ উক্ত খিলাফত সম্মেলনে যোগ দেন। তিনি খেলাফতের বিষয়ে কংগ্রেসের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ-অক্টোবর মাস পর্যন্ত মাওলানা মোহম্মদ আলীর নেতৃত্বে একটি ডেপুটেশন খিলাফতের ভবিষ্যৎ আলোচনার জন্য লন্ডন ও প্যারিস সফর করেন। কিন্তু বৃটেন অথবা মিত্রপক্ষের কেউই এ ডেপুটেশনকে কোনো বিশেষ গুরুত্ব দেয় নি। ফলে প্রতিনিধিরা ব্যর্থ হয়ে দেশে ফিরে আসলে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন আরও তীব্র এবং জোরদার হয়। ১৯২০ সালের ১৯ মার্চ সারা ভারতে খিলাফতের দাবিতে হরতাল পালিত হয়। মে মাসে বোম্বেতে খেলাফত কমিটির সভায় বৃটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। জুন মাসে এলাহাবাদে

খিলাফত কমিটির আহবানে হিন্দু ও মুসলিম নেতাদের এক সভায় অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি চূড়ান্ত করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়।

ইতোমধ্যে খিলাফত আন্দোলনের পাশাপাশি আরেকটি আন্দোলন কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে গড়ে তোলার প্রস্তুতি চলে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বৃটিশ সরকার চরমপন্থী বিপ্লবী আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে নিবর্তনমূলক রাওলাট আইন পাশ করে এবং বিনা বিচারে শত শত লোককে কারাবন্দী করে। উক্ত আইনের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ ও প্রতিবাদ আন্দোলনের পটভূমিতে সংঘটিত হয় ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। বৃটিশ জেনারেল ডায়ার নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালিয়ে প্রায় ৪০০ লোককে হত্যা করে। এতে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব চাঙ্গা হয়ে উঠে। মহাত্মা গান্ধী মুসলমানদের সহযোগিতা লাভের জন্য ইতিপূর্বে সৃষ্ট খিলাফত আন্দোলন সমর্থন করেন। তিনি বৃটিশদের দেয়া 'কায়সার-ই-হিন্দ' উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন।

উল্লেখ্য যে, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১০ আগস্ট সেভার্স চুক্তির পর এর প্রতিবাদে মুসলমানগণ ৩১ আগস্ট খিলাফত দিবস পালন করে। ঐ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের এবং পূর্ণ স্বরাজের দাবির ঘোষণা দেয়া হয়। জাতীয় কংগ্রেস অসহযোগের কর্মসূচি হিসেবে সরকারী চাকুরী ও পদবী ত্যাগ, সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ আদালত ও আইন ব্যবসা বর্জন, বিলাতী দ্রব্য পরিহার ইত্যাদি প্রস্তাব গ্রহণ করে। একই সময়ে নাগপুরে খিলাফত কমিটি ও মুসলিম লীগ অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তারিত কর্মসূচি অনুমোদন করে এবং স্বরাজ উভয়ের মূল লক্ষ্য বলে ঘোষণা দেয়। ফলে খিলাফত ও অসহযোগ হিন্দু মুসলমানের যৌথ আন্দোলনে পরিণত হয়।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে উভয় আন্দোলন তীব্র ও ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং এক চরম অবস্থার সৃষ্টি হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করে, শ্রমিকরা কারখানা ত্যাগ করে, সরকারী চাকুরীতে ভারতীয়রা ইস্তফা দেয় এবং আইনজীবীরা আদালত ছেড়ে চলে যায়। আন্দোলনের জন্য তহবিল সংগ্রহ ও স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠন গড়া রাজনৈতিক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়। দমন নীতির অংশরূপে বৃটিশ সরকার হাজার হাজার লোককে গ্রেফতার করে। অনেকে আবার স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেন। মুসলমানরা বৃটিশ সেনাবাহিনী ত্যাগের হুমকি দেয়।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে আহমেদাবাদে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয় এবং সর্বত্র অচলাবস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকারকে কর ও খাজনা প্রদান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু আন্দোলনের সে চূড়ান্ত পর্যায়ে অহিংসার স্থলে সহিংসতার ঘটনা ঘটে। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে মালাবারে মোপলা কৃষকরা জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং দাঙ্গা হাঙ্গামার আশ্রয় নেয়। এরপর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারিতে উত্তর প্রদেশের চৌরিচোরা নামক স্থানে একদল বিক্ষুব্ধ জনতা থানা আক্রমণ করে ২১ জন সিপাহী ও একজন দারোগাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে।

গান্ধী তাঁর অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন এভাবে সহিংসায় পরিণত হতে দেখে মর্মাহত হন। কংগ্রেসের বারদালি সম্মেলনে তিনি হঠাৎ সমগ্র আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। এতে সারাদেশে হতাশার সৃষ্টি হয়। সরকার শীঘ্রই গান্ধীকে গ্রেফতার করে। অসহযোগ আন্দোলনের অবসানে খিলাফত আন্দোলনও দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কে কামাল আতাতুর্ক খিলাফত উচ্ছেদ করার পর এ আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটে। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন সফল না হলেও সে গণজাগরণ ছিল অভূতপূর্ব ও অবিস্মরণীয়। উপমহাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে আন্দোলন দুটির অবদান ও গুরুত্ব অপরিসীম।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে হিন্দু-মুসলিম যৌথ আন্দোলনের পটভূমি বর্ণনা করে একটি রচনা লিখুন।

সারাংশ

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এটাই ছিল প্রথম জাতীয় ভিত্তিক গণআন্দোলন। তুরস্কের খিলাফতের মর্যাদা রক্ষার জন্য ভারতের মুসলমানগণ খিলাফত আন্দোলনে যোগ দেয়। অন্যদিকে অসহযোগের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জন্য স্বরাজ অর্জন। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও আন্দোলন দুটি একই সঙ্গে ও যৌথ নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। কিন্তু অহিংস পন্থায় আন্দোলন

চালানো সম্ভব হচ্ছে না দেখে হঠাৎ গান্ধী আন্দোলন বন্ধ ঘোষণা করেন। এর ফলে খিলাফত আন্দোলনও শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং তুরস্কে কামাল আতাতুর্ক খিলাফত প্রতিষ্ঠান বাতিল ঘোষণা করায় ভারতবর্ষে এ আন্দোলন অকেজো হয়ে পড়ে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন দেশের ঘটনায় খিলাফত আন্দোলনের সূচনা হয়?
ক) বাংলা খ) ভারত গ) ব্রিটেন ঘ) তুরস্ক

২। 'কায়সার-ই-হিন্দ' কার উপাধি?
ক) এ কে ফজলুল হক খ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ গ) মহাত্মা গান্ধী ঘ) মতিলাল নেহেরু

৩। খিলাফত আন্দোলন চূড়ান্তভাবে বন্ধ হওয়ার কারণ কী?
ক) অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত হলে খ) তুরস্কে কামাল আতার্তুক ক্ষমতায় এলে
গ) সরকারের দমন অভিযান শুরু হলে ঘ) খিলাফত নেতাদের বন্দী করলে

৪। অসহযোগ আন্দোলনে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কোন পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছিল?
ক) অহিংস পদ্ধতিতে খ) হিংসাত্মক কার্যক্রমের মাধ্যমে
গ) গুপ্ত সমিতির মাধ্যমে ঘ) আইন অমান্য পদ্ধতিতে

সৃজনশীল প্রশ্ন

শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও নির্যাতনমূলক আইন এবং একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে একটি অঞ্চলের দুটি সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ দুটি পৃথক আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ পারস্পরিক ঐক্যের মাধ্যমে একত্রিত হয়। এতে উভয় আন্দোলন শাসকগোষ্ঠীকে প্রায় কোনঠাসা করে ফেলে। এক পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন কারণে আন্দোলন দুটি থেমে গেলেও এর ব্যাপক প্রভাব শাসকগোষ্ঠীর অবস্থাকে সংকটাপন্ন করেছিল।

ক. ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে কারা পৃথক নির্বাচনের অধিকার লাভ করে? ১
খ. "১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন ছিল এক রকম দ্বৈত শাসন।" উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. বর্ণিত আন্দোলন দুটি ব্রিটিশ শাসনাধীনে কোন কোন ভারতীয় আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. উক্ত আন্দোলনের দুটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-১০.৩ বাংলায় সশস্ত্র আন্দোলন (১৯১১-৩৪ খ্রি.)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলায় সশস্ত্র আন্দোলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- আন্দোলনের সাথে জড়িত সংগঠন এবং নেতাদের নাম বলতে পারবেন।
- সশস্ত্র আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	বিপ্লব, মাস্টার দা, প্রীতিলতা, দ্বীপান্তর

সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত ঘটে মহারাষ্ট্রে। কিন্তু পরে এ আন্দোলন অধিক জোরদার হয়ে উঠে বাংলায়। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনে সরকারী দমন নীতির মোকাবেলায় বাংলার এক শ্রেণির যুবক বিপ্লব ও

সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নেয়। বিভিন্ন গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তারা বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্ম পরিচালনা করে এবং সশস্ত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বৃটিশ সরকারকে উৎখাতের চেষ্টা করে। গুপ্ত সমিতিগুলোর মধ্যে 'ঢাকার অনুশীলন সমিতি' ও কলকাতার 'যুগান্তর সমিতি' ছিল প্রধান। সারাদেশে এসব সংগঠনের অনেক শাখা প্রশাখা ছিল। 'যুগান্তর' নামে যুগান্তর সমিতির একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও বের হতো। এ দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র ঘোষ, ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত প্রমুখ বিপ্লবীগণ। ঢাকার অনুশীলন সমিতির প্রধান সংগঠক ছিলেন পুলিন বিহারী দাস। গুপ্ত হত্যা, সন্ত্রাস ও ডাকাতির মাধ্যমে ইংরেজ প্রশাসনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে এসব সংগঠনের নেতারা বোমা তৈরি, অস্ত্র সংগ্রহসহ নানাবিধ কাজে জড়িত হয়। পূর্ব বাংলা ও আসামের প্রথম লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলারকে দুবার হত্যার চেষ্টা চলে। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টায় নিয়োজিত প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করেন এবং একই অপরাধে ধৃত ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। সরকার মানিকতলা বোমা হামলাসহ বিভিন্ন অভিযোগে আরও কয়েকজনকে ফাঁসি দেন এবং অনেককে কারাবন্দী ও দ্বীপান্তর করা হয়। সরকারী দমন নীতির ফলে এবং বিপ্লবী নেতাদের একাধিক ব্যক্তি এ রাজনীতি থেকে সরে পড়ায় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদের পূর্বেই বাংলার প্রথম পর্যায়ের সশস্ত্র আন্দোলন কিছুটা থেমে আসে।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে বিপ্লবী আন্দোলন প্রধানত কলকাতা কেন্দ্রিক ছিল। ঐ সময় কলকাতার রাজাবাজারে অমৃত হাজরার পরিচালনায় একটি বোমার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতা, যশোর ও খুলনায় অনেকগুলো সশস্ত্র ডাকাতি হয়। একই বছরের শেষ দিকে বিপ্লবী নেতা রাস বিহারী বসুর পরিকল্পনা অনুযায়ী দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জকে লক্ষ করে বোমা ছোঁড়া হয়। কিন্তু তিনি অল্পের জন্য বেঁচে যান। সরকার রাস বিহারীকে ধরার জন্য এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলায় বিপ্লবীদের মধ্যে একদল বিদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে সম্মুখ যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে থেকে ক্ষমতা দখলের নীতি গ্রহণ করে। এঁদের মধ্যে ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘা যতীন, ডা. যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ। নরেন্দ্র নাথ পরে এম.এন.রায় নামে বিখ্যাত হন। তাঁরা ইংরেজ বিরোধী শক্তি জার্মানি থেকে অস্ত্র সাহায্যের আশ্বাস পান। কিন্তু ইংরেজ সরকার বিপ্লবীদের এ চক্রান্তের কথা আগেই জেনে যাওয়ায় জার্মানির জাহাজ আসার পথ রুদ্ধ হয়। এ দিকে বাঘা যতীন ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী উড়িষ্যার বালেশ্বরে জার্মান জাহাজের উপস্থিতির আশায় হাজির হয়েছিলেন। তাঁদের আগমনের সংবাদ পেয়ে কলিকাতা থেকে পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট একদল সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। বাঘা যতীন ও তাঁর সহকর্মীদের সাথে পুলিশ বাহিনীর গুলি বিনিময়কালে চিত্ত প্রিয় নামের একজন বিপ্লবী নিহত হন। অন্য তিন আহত সহকর্মীসহ বাঘা যতীন ধরা পড়েন এবং বন্দী অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর দুই সহকর্মীর ফাঁসি হয় এবং একজন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

কিন্তু এসব ব্যর্থতা বিপ্লবীদের হতোদ্যম করেনি। দেশি বিদেশি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী হত্যা অব্যাহত ছিল। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি পুলিশের ডেপুটি সুপার বসন্ত চট্টোপাধ্যায়কে ভবানীপুরে হত্যা করা হয়। পুলিশের সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধ লেগে থাকত প্রায়ই। ১৯১৬-১৭ খ্রিস্টাব্দে এর মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার ভারত প্রতিরক্ষা আইনে অনেককে গ্রেফতার করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে এদের মুক্তি দেয়া হয়।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করার পর বাংলায় আবার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শুরু হয়। পর বছর 'লাল বাংলা' শীর্ষক প্রচার পত্রে অত্যাচারী পুলিশ কর্মচারীদের হত্যার আহবান জানানো হয়। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে গোপীনাথ সাহা নামে জনৈক বিপ্লবী কলিকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলক্রমে মি: ডে নামে সাহেবকে হত্যা করে। উক্ত ঘটনায় গোপীনাথের ফাঁসি হয়। সে বছরের মার্চ মাসে দক্ষিণেশ্বরে বোমা তৈরির এক গোপন কারখানা আবিষ্কৃত হয়। আলিপুর জেলের সুপার বন্দি বিপ্লবীদের পরিদর্শন করতে গেলে প্রমোদ চৌধুরী তাঁকে লোহার রড় দিয়ে হত্যা করে। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে সরকার বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স জারী করে বহু বিপ্লবীকে কারারুদ্ধ করেন। এর ফলে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ অনেকাংশে হ্রাস পায়।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করলে বৈপ্লবিক ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ পুনরায় বাড়ে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে সুর্যসেন, যিনি মাস্টার দা নামে অধিক পরিচিত, তাঁর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়। সূর্যসেনের সহযোগী ছিলেন অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, অনন্ত সিংহ ও অন্যান্য বহু বিপ্লবী। জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে পুলিশের যে সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে, তাতে সূর্যসেনের ১২জন সঙ্গীর মৃত্যু হয়। সেনাবাহিনীর মধ্যে হতাহতের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন বাংলার যুব সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং একের পর এক নানা সংঘর্ষ ঘটতে থাকে। ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ছাত্র বিনয় বসু পুলিশের বড় সাহেব লোম্যানকে গুলি করে হত্যা করে। বহুদিন আত্মগোপন করার পর অবশেষে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে সূর্যসেন পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। কলকাতায় যুগান্তর দলও এ সময় সক্রিয় ছিল। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ আগস্ট ডালহৌসী স্কোয়ারে চার্লস

টেগার্টকে হত্যা করার আরো একটি চেষ্টা নিষ্ফল হয়। ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল সিম্পসনকে হত্যা করেন। বিনয় ও বাদল এর পর আত্মঘাতী হন এবং পুলিশের হাতে ধরা পাড়ার পর দীনেশের ফাঁসি হয়। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্ব দেন ও দেশের জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করেন। ঐ বছরই বীনা দাস বাংলার গভর্নর জ্যাকসনকে হত্যার চেষ্টা করেন। তাঁর সে চেষ্টা অবশ্য ব্যর্থ হয় এবং তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এ দিকে মেদেনীপুরে ১৯৩১ থেকে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পর পর তিনজন ইউরোপীয়ান ম্যাজিস্ট্রেট জেমস পেডি, বরার্ট ডগলাস এবং বার্জ বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স নামের বিপ্লবী উপদলের হাতে নিহত হন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের পর বাংলার সশস্ত্র আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায় এবং বিপ্লবীদের রাজনৈতিক কর্মধারা ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ প্রীতিলতার বিপ্লবী জীবনের উপর একটি নাটিকা মঞ্চস্থ করবেন।

সারাংশ

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের পরিণতিতে বাংলায় সশস্ত্র আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। প্রধান দুটি সংগঠন যুগান্তর সমিতি ও অনুশীলন সমিতি বিপ্লবী আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ কাজ করে। সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে বৃটিশ সরকারকে উৎখাত করার লক্ষ্যে বাংলার অসংখ্য যুবক এ আন্দোলনে অংশ নেয় এবং জীবন উৎসর্গ করে। সরকারকে সন্ত্রস্ত করার জন্য বিপ্লবীরা পুলিশ কর্মকর্তাসহ বহু সরকারী অফিসারকে হত্যা করে। বিদেশি সাহায্য নিয়ে অভ্যুত্থান ঘটাবার চেষ্টাও করা হয়েছিল। কিন্তু এসবই ব্যর্থ হয়। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের পর বাংলার বিপ্লবী সশস্ত্র আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ঢাকার অনুশীলন সমিতির প্রধান সংগঠন কে ছিলেন?
ক) অরবিন্দ ঘোষ খ) বারীন্দ্র ঘোষ গ) পুলিন বিহারী দাস ঘ) ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত

২। বাঘা যতীন কীভাবে মারা যান?
ক) পুলিশের সাথে সংঘর্ষে খ) ফাঁসির দন্ড পেয়ে
গ) কারাগারে বন্দী অবস্থায় ঘ) আত্মঘাতি বোমার বিস্ফোরণে

৩। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?
ক) সূর্য সেন খ) গনেশ ঘোষ গ) প্রীতিলতা ঘ) লোকনাথ বল

৪। 'মাস্টার দা' নামে কোন নেতা পরিচিত?
ক) এম এন রায় খ) রাসবিহারী বসু গ) পুলিন বিহারী দাস ঘ) সূর্যসেন

পাঠ-১০.৪ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন প্রবর্তিত হওয়ার কারণ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- উক্ত আইনের গুরুত্ব বা ত্রুটি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	ভারত শাসন আইন, দ্বৈত শাসন, হস্তান্তর, সংরক্ষিত

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। লক্ষ্ণৌচুক্তির মাধ্যমে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের লক্ষ্যে এক যৌথ দাবিনামা সরকারের নিকট পেশ করে। এ দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং ভারতবাসীকে আরো অধিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকার আইন সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। এই লক্ষে ভারত সচিব মন্টেগু ও ভারতের বড়লাট চেমসফোর্ড একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এর ভিত্তিতেই ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে একটি শাসনতান্ত্রিক সংস্কার আইন পাস করা হয়। ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ সংস্কার আইন 'মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার' আইন নামে পরিচিতি।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের কার্যাদি যথাসম্ভব সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র সম্পর্ক, মুদ্রা, বাণিজ্য, রেল ও ডাক প্রভৃতি সর্বভারতীয় বিষয়গুলো ন্যস্ত করা হয়। প্রদেশের হাতে অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা, বিচার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জেল, সেচ, স্থানীয় সরকার প্রভৃতির দায়িত্ব রাখা হয়। কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সরকারী আয় ও বণ্টন করে দেয়া হয়।

এ আইনে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। পূর্বের ন্যায় ভারতের বড়লাট ও ভারত সচিব বৃটিশ পার্লামেন্টের নিকট দায়ী থাকেন, ভারতীয় আইন সভার নিকট নয়। ভারতের কেন্দ্রীয় আইন সভাকে পুনর্গঠন করে রাষ্ট্র পরিষদ ও আইন পরিষদ নামে দুটি কক্ষে ভাগ করা হয়। রাষ্ট্রপরিষদ বা উচ্চকক্ষের সদস্যসংখ্যা ৬০ জনে নির্ধারিত করা হয়, এর মধ্যে ৩৪ জন নির্বাচিত সদস্য ও বাকী ২৬ জন বড়লাট কর্তৃক মনোনীত হবেন। আইন পরিষদ বা নিম্নকক্ষের সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হয় ১৪৫ জনে, এদের মধ্যে ১০৫ জন নির্বাচিত এবং বাকীরা মনোনীত হবেন। মনোনীতদের মধ্যে ২৬ জন সরকারী কর্মচারী এবং অবশিষ্ট হবেন বেসরকারী সদস্য। রাষ্ট্রপরিষদ ও আইন পরিষদের মেয়াদ যথাক্রমে ৫ ও ৩ বছর করা হয়। রাষ্ট্র পরিষদেই সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এ আইনে মুসলমান সম্প্রদায় ছাড়াও পাঞ্জাবের শিখ, ভারতীয় খ্রিস্টান, এ্যাংলো ইন্ডিয়ান এবং ইউরোপীয়গণও পৃথক নির্বাচনের সুযোগ ও অধিকার লাভ করে।

যদিও কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছিল, তথাপি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদকে সমগ্র ভারতের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়া হয়। কোন কোন বিষয়ে আইন সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপনের পূর্বে বড়লাটের অনুমতি নেয়ার বিধান রাখা হয়। অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রস্তাব একমাত্র আইন পরিষদেরই বিবেচনার এখতিয়ার নির্ধারিত হয়। তবে কোন বিল বা আইনের খসড়া আইন পরিষদে অগ্রাহ্য হলেও বড়লাট তা কার্যকরী করতে পারতেন। ফলে এ বিষয়ে আইন পরিষদের ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী বার্মা ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশসহ মোট দশটি গভর্নর শাসিত প্রদেশ ছিল। প্রচুর ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধার অধিকারী গভর্নর প্রদেশের যথার্থ কর্তৃত্বের অধিকারী হন। প্রাদেশিক শাসন কার্য 'সংরক্ষিত' ও 'হস্তান্তরিত'-এ দুভাগে ভাগ হয়ে এক ধরনের দ্বৈত শাসনের সূত্রপাত ঘটায়। আইন-শৃংখলা, অর্থ, পূর্ত, বিচার, রাজস্ব প্রভৃতি বিষয়গুলো সংরক্ষিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং গভর্নর ও তাঁর শাসন পরিষদ কর্তৃক শাসিত হতো। পক্ষান্তরে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, কৃষি, স্থানীয় শাসন প্রভৃতি হস্তান্তরিত বিষয়াদির অধীনে থাকে। গভর্নর তাঁর মন্ত্রীসভার পরামর্শক্রমে এগুলো শাসন ও পরিচালনা করবেন। এসব দায়িত্ব পালনের জন্য মন্ত্রীসভা প্রাদেশিক আইন সভার নিকট দায়ী ছিল। সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত উভয় বিষয়গুলোর উপর গভর্নরের অবাধ কর্তৃত্ব বহাল রাখা হয়। গভর্নর প্রাদেশিক আইন সভার সদস্যগণের মধ্য হতে যেকোন সদস্যকে মন্ত্রী নিয়োগ করার অধিকারী হন।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে বৃটিশ ভারতের প্রদেশগুলোতে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার ব্যবস্থা রাখা হয় এবং এর সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়। তা ছাড়া এ আইনে প্রাদেশিক আইন পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা শতকরা ৭০ জনের কম এবং সরকারী সদস্যের সংখ্যা ২০ জনের অধিক হবে না বলা হয়।

এ আইনে ইংল্যান্ডে ভারতীয় হাই কমিশনার পদের সৃষ্টি হয়। তিনি সেখানে ভারতীয় ছাত্র ও শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করতেন। ভারত সরকার কর্তৃক তিনি ৫ বছরের জন্য নিয়োগ পেতেন।

শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দিক থেকে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন ছিল নি:সন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। প্রথমত, এ আইন দ্বারা প্রত্যক্ষ নির্বাচনের প্রথা চালু হয় এবং ভোটাধিকারও সম্প্রসারিত হয়। দ্বিতীয়ত, আইন সভার নিকট দায়ী মন্ত্রীপরিষদ এর মাধ্যমে গঠিত হয়। এসব মন্ত্রীরা ছিলেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও বেসরকারী ব্যক্তি। সুতরাং এতে দায়িত্বশীল সরকারের সূচনা হয়েছিল বলা যায়। তৃতীয়ত, এ আইনের ফলে ভারতীয় জনগণ রাজনৈতিক জ্ঞান ও শাসনকার্যের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পায়।

তবে এ আইনের সমালোচনাও ছিল। কংগ্রেস অধিবেশনে এ আইনকে অপর্যাপ্ত ও নৈরাশ্যজনক বলে অভিহিত করা হয়। বস্তুত যথার্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসেবে বিচার করলে কেন্দ্র ও প্রদেশের শাসন পদ্ধতির ক্ষেত্রে এ আইনের ত্রুটি চোখে পড়ে। প্রথমত, সর্বক্ষেত্রেই কার্যনির্বাহক পরিষদ আইনসভার নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত ছিল। দ্বিতীয়ত, প্রদেশের শাসনকার্য

সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত এ দুভাগে ভাগ করে একদিকে ক্ষমতাহীন দায়িত্ব ও অন্যদিকে দায়িত্বহীন ক্ষমতা অর্পনের ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয় এবং প্রশাসনিক দক্ষতা নষ্ট হয়। দায়িত্বশীল সরকার গঠনের পথে এটা অন্তরায় সৃষ্টি করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের উপর একটি রচনা লিখবেন।

সারাংশ

মর্লি-মিন্টো সংস্কারের ব্যর্থতা নতুনভাবে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবিকে জোরালো করে তোলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ লক্ষ্ণৌচুক্তি নামে এক যৌথ দাবিনামায় ভারতীয়দের পক্ষ থেকে নিজেদের কথা তুলে ধরেন। পরবর্তী সময়ে মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার বা ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে ঐ দাবিনামার কিছু বৃটিশ সরকার বিবেচনা করে। কিন্তু তা সত্বেও দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তন বা স্বরাজ প্রতিষ্ঠা ভারতীয়দের কোনো দাবিই গৃহীত হয় নি। বস্তুত ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ভারত শাসন আইনে এক প্রকার এককেন্দ্রিক শাসনই প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন অন্য কী নামে পরিচিত ছিল?
ক) স্বায়ত্ত শাসন আইন খ) ভারত স্বাধীনতা আইন
গ) মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন ঘ) মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার আইন

২। ভারত শাসন আইন ১৯১৯-এ রাষ্ট্র পরিষদের সদস্য সংখ্যা কতজন নির্ধারিত হয়?
ক) ৪০ খ) ৬০ গ) ১০৫ ঘ) ১৪৫

৩। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে গভর্নর শাসিত প্রদেশের সংখ্যা কত?
ক) ৩ খ) ৫ গ) ১০ ঘ) ১৪

৪। মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার আইনের প্রাদেশিক শাসনে কোনটি হস্তান্তরিত বিষয়?
ক) স্থানীয় প্রশাসন খ) পূর্ত বিভাগ গ) বিচার বিভাগ ঘ) রাজস্ব আদায়

পাঠ-১০.৫ বেঙ্গল প্যাক্ট, ১৯২৩ খ্রি.

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বেঙ্গল প্যাক্টের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- বেঙ্গল প্যাক্টের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- বেঙ্গল প্যাক্টের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	বেঙ্গল প্যাক্ট, দেশবন্ধু, সংরক্ষিত চাকুরী

স্বরাজ্য দলের নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং বাঙালি মুসলিম নেতা সিলেটের অধিবাসী আবদুল করিম ছিলেন ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত বেঙ্গল প্যাক্টের উদ্যোক্তা। উদার চিত্ত রাজনীতিক দেশবন্ধু অনুভব করেছিলেন যে, মুসলমানদের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া ভারতের জন্য স্বরাজ অর্জন সম্ভব নয়। তিনি মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা ও নায্য দাবি পূরণে উদার মনোভাব প্রদর্শন করেন এবং সে কারণে রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য

উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর ফরোয়ার্ড পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে বাংলার মুসলমানদেরকে তাদের নায্য হিস্যা দিতে হবে। তারা সুযোগ্য হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুক- এ দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এ যুক্তি দিয়েই বিদেশি শক্তি হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই শাসন ক্ষমতা থেকে দূরে রেখেছে। চিত্তরঞ্জন দাস বাংলার মুসলমানদের নেতা ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন এবং হিন্দু-মুসলমানদের দাবি দাওয়ার ব্যাপারে একটি চুক্তি সম্পন্ন করেন। এ চুক্তি 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বা 'বাংলা চুক্তি' নামে পরিচিত।
অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর চিত্তরঞ্জন দাসের সাথে কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের মতানৈক্য হয়। সি.আর.দাস ও তাঁর সমর্থকগণ ব্যবস্থাপক পরিষদগুলোতে যোগদানের পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁরা আইনসভায় প্রতিবন্ধকতামূলক নীতি অবলম্বন করে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের সংস্কার আইন অচল করে দিতে চেয়েছিলেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে তাঁর দেয়া উক্ত প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। এতে ব্যর্থ হয়ে তিনি মতিলাল নেহেরু ও হাকিম আজমল খানকে নিয়ে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর 'স্বরাজ্য পার্টি' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। অল্প সময়ের মধ্যে স্বরাজ্য পার্টির সমর্থকগণ বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং সি.আর. দাস ও সুভাষ বসু যথাক্রমে এর সভাপতি ও সেক্রেটারি নির্বাচিত হন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন একজন দূরদর্শী ও বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ। তিনি বুঝেছিলেন যে ব্যবস্থাপক পরিষদে মুসলমানদের সমর্থন লাভ করতে পারলে তিনি সেখানে তাঁর 'প্রতিবন্ধক নীতি' কার্যকরী করতে সক্ষম হবেন। তাছাড়া তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের নায্য অধিকার স্বীকার করতেন এবং স্বরাজ লাভে তাদের সহযোগিতা ও সমর্থন যে অত্যাবশ্যক তা বিশ্বাস করতেন। ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দী সহ কয়েকজন মুসলিম নেতার সঙ্গে তিনি মত বিনিময় করেন এবং শেষে তাঁদের সঙ্গে বেঙ্গল প্যাক্ট নামক রাজনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর এটি স্বরাজ্য পার্টির কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা ঐক্যমতে আসেন যে, যখন স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে তখন এ চুক্তির শর্তানুযায়ী প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ অধিকার ভোগ করবে। লোকসংখ্যার অনুপাতে ও স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থায় বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রতিনিধিত্বের বিধান থাকবে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রত্যেক জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় শতকরা ৬০টি আসন পাবে এবং সংখ্যালঘুরা পাবে শতকরা ৪০টি আসন। মুসলমানদের জন্য সরকারি চাকুরীর ৫৫% সংরক্ষিত থাকবে এবং যে পর্যন্ত তারা এ সংরক্ষিত পর্যায়ে না পৌঁছে সে পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে শতকরা ৮০ জনকে সরকারি চাকুরীতে নিয়োগ করা হবে। এ ক্ষেত্রে নূন্যতম যোগ্যতার ভিত্তিতে তাদেরকে চাকুরীতে নেয়া হবে। পরে মুসলমানগণ চাকুরীর ৫৫% ও অসুমলমানরা ৪৫% লাভ করবে। আইন পরিষদে যেকোন সম্প্রদায়ের তিন চতুর্থাংশ সদস্যের সমর্থন না থাকলে ঐ সম্প্রদায়ের ধর্ম সম্পর্কীয় কোনো আইন গৃহীত হবে না। মসজিদের সামনে গান বাজনা ও শোভাযাত্রা করা চলবে না এবং ধর্মীয় অনুশাসনের জন্য গরু জবাই করা হলে সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

উপরিউক্ত চুক্তির ফলে সি.আর. দাসের হাত শক্তিশালী হয়। ফলে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের কাউন্সিল নির্বাচনে স্বরাজ্য পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। মুসলমানদের সংরক্ষিত ৩৯টি আসনের মধ্যে এ দল ১৯টি লাভ করে এবং পরে আরো দুজন এতে যোগ দেয়। পরের বছর কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে স্বরাজ্য পার্টি ৭৫টি নির্বাচিত আসনের মধ্যে ৫৫টি লাভ করে। সি.আর. দাস মেয়র এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন। বেঙ্গল প্যাক্টের শর্ত অনুযায়ী কলকাতা কর্পোরেশনের চাকুরিতে কতিপয় মুসলমানকে নিয়োগ করা হয়। মুসলমানদের সমর্থন লাভ করার ফলে আইন সভায় স্বরাজ্য পার্টির একটি শক্ত ভিত গড়ে উঠে এবং সি.আর. দাস সরকারকে বিভিন্ন পদক্ষেপে বাধা দিতে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁর বিপক্ষ দল এতে নিশ্চুপ ছিল না। খান বাহাদুর মোশাররফ হোসেনকে দিয়ে সরকার স্বরাজ্য পার্টি বহির্ভূত মুসলমানদেরকে এর বিরুদ্ধে ব্যবহারের চেষ্টা করেন। কিন্তু সরকারের সে চেষ্টা নিষ্ফল হয়।

এ চুক্তির ফলে স্বভাবতই মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ খুশী হন। হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির একটা আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। কিন্তু শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত ও জমিদার শ্রেণি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। তাদের নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র বেঙ্গল প্যাক্টের বিরূপ সমালোচনা করে। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের কোকনাদ অধিবেশনে এ চুক্তি সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব প্রদর্শিত হয়। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে কোনো পৃথক প্রাদেশিক চুক্তি মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। এর ফলে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে সি.আর দাসের মৃত্যুর পর বেঙ্গল প্যাক্ট অকার্যকর হয়ে যায়। বাংলায় হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান করতে চেয়ে তিনি যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দেন তাঁর অনুসারীরা সেটি অনুধাবন করতে ব্যর্থ

হয়। স্বরাজ্য পার্টির কর্মসূচির মধ্যে অনেক পরিবর্তনের ফলে হিন্দু মুসলমান সভ্যদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। সাম্প্রদায়িকতা পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। এর ফলে হিন্দু মুসলিম ঐক্যে ভাঙ্গন ধরে এবং সি.আর. দাসের বেঙ্গল প্যাক্ট অচল হয়ে পড়ে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের রূপকার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জীবনের উপর একটি আলোচনা সভার আয়োজন করবেন।

সারাংশ

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের উদ্যোগে বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সহযোগিতা ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি চুক্তি হয়। এ চুক্তিই বেঙ্গল প্যাক্ট নামে পরিচিত। এ চুক্তিতে মুসলমান সম্প্রদায়কে কিছু বেশি সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যুতে এবং কংগ্রেস ও হিন্দুদের বিরোধিতার কারণে এ চুক্তি অকার্যকর হয়ে পড়ে। রাজনীতিতে পুনরায় সাম্প্রদায়িকতা মাথা তুলে দাঁড়ায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। স্বরাজ্য পার্টি গঠিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে?

ক) ১৯২২ খ) ১৯২৩ গ) ১৯২৪ ঘ) ১৯২৫

২। বেঙ্গল প্যাক্টের উদ্যোক্তা কে?

i. চিত্তরঞ্জন দাস ii. আবদুল করিম iii. সুভাষ বসু

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। স্বরাজ্য পার্টির সেক্রেটারি ছিলেন কে?

ক) মতিলাল নেহেরু খ) হাকিম আজমল গ) সি আর দাস ঘ) সুভাষ বসু

৪। বেঙ্গল প্যাক্ট চুক্তি স্বাক্ষর করেন কে?

i. চিত্তরঞ্জন দাস ii. এ কে ফজলুল হক iii. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১০.৬ নেহেরু রিপোর্ট

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নেহেরু রিপোর্ট কেন তৈরি হয়েছিল, তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- নেহেরু রিপোর্টের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- নেহেরু রিপোর্টের প্রতি বিভিন্ন দলের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	নেহেরু রিপোর্ট, ডোমিনিয়ন, যৌথ নির্বাচন

উপমহাদেশের শাসনতান্ত্রিক বিকাশের ইতিহাসে নেহেরু রিপোর্ট এক মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে বেসরকারী উদ্যোগে ভারতের জন্য সংবিধানের খসড়া রচনার ভার পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে

একটি কমিটির উপর অর্পিত হয়। উক্ত কমিটির সুপারিশ ভিত্তিক দলিল 'নেহেরু রিপোর্ট' নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার আইন ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়। এ বিষয়ে পুনরায় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ভাইসরয় লর্ড আরউইন জন সাইমনের নেতৃত্বে একটি পার্লামেন্টারি কমিশন নিয়োগ করেন। কিন্তু সাইমন কমিশনে কোনো ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব না থাকায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একে মেনে নিতে অস্বীকার করে। এ কমিশনকে বর্জন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং যেদিন উক্ত কমিশনের সদস্যরা ভারতে পদার্পণ করেন সেদিন হরতাল আহবান করা হয় এবং 'সাইমন ফিরে যাও' ধ্বনি উত্থিত হয়। ইত্যবসরে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন-পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের উন্নতি বিধানে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ একের পর এক প্রয়াস চালিয়ে যান। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানের জন্য অন্যান্য দলের সাথে মত বিনিময় করে একটি 'স্বরাজ শাসনতন্ত্র'-এর খসড়া প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অন্যদিকে মুসলিম লীগও একটি সাব কমিটি গঠন করে প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের খসড়ায় নিজেদের দাবি দাওয়া যাতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তার ব্যবস্থা করে। পরে সব দলের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য কংগ্রেস একটি সর্বদলীয় সভা ডাকে।

ইতোমধ্যে ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেড ভারতীয়দের সর্বসম্মত একটি শাসনতন্ত্র রচনার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। এ লক্ষ্যে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে এলাহাবাদে সর্বদলীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে বিরোধের কারণে কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব হয় না। ১৯ মে তৃতীয় বারের মতো সর্বদলীয় সম্মেলন বসে বোম্বেতে। উক্ত সম্মেলনে সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এ কমিটিতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা ছিলেন এবং কমিটির নেতৃত্ব দেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। কমিটির প্রস্তাবে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে কতগুলো দাবি চূড়ান্ত করা হয়।

নেহেরু রিপোর্ট

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের নেহেরু রিপোর্টে ভারতের জন্য পূর্ণ ডোমিনিয়নের মর্যাদা দাবি করা হয়। দায়িত্বশীল সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট একটি আইন সভা গঠনের প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবিত আইন সভার ক্ষমতা হবে সর্বোচ্চ এবং শাসন বিভাগের উপর আইন সভার পূর্ণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রদেশগুলোর ক্ষেত্রে ও দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয় এবং কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে পৃথক করে দেয়া হয়। প্রদেশগুলোতে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রতিষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নিম্নকক্ষ ও প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলো জনগণের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত হবে। আগেকার সমস্ত আইনে স্বতন্ত্র নির্বাচনের যে নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল এ প্রস্তাবে তা প্রত্যাহার করে যৌথ নির্বাচন নীতি গ্রহণ করা হয়। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের কোন ব্যবস্থা রাখা হয় নি। তবে কেন্দ্র ও অমুসলমান প্রধান প্রদেশগুলোতে লোকসংখ্যার ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণের নীতি গৃহীত হয়। কিন্তু পাঞ্জাব ও বাংলার ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য কোনো আসন সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা ছিল না। আপাতত দশ বছরের জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থে আসন সংরক্ষণ প্রথা চালু থাকবে। ডোমিনিয়ন মর্যাদা দানের পর সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে আলাদা প্রদেশরূপে স্বীকৃতি দিয়ে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের মর্যাদা প্রদান করা হবে। তবে সেখানে অমুসলিম সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত থাকবে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তার কথা বলা হয়।

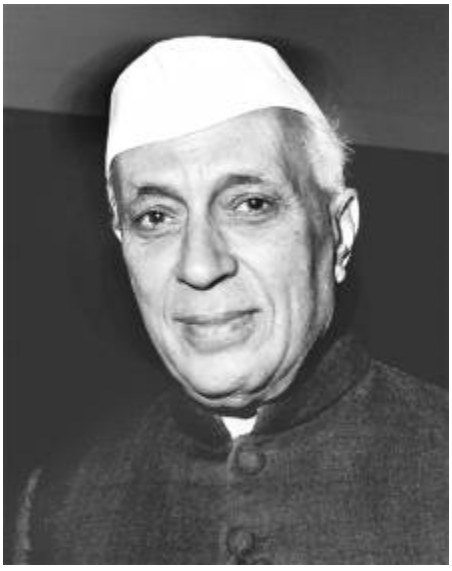

জরহরলাল নেহেরু

নেহেরু রিপোর্ট প্রকাশিত হলে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো পৃথকভাবে এ রিপোর্টের বিচার বিবেচনা করে। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের কার্য নির্বাহক সমিতি নেহেরু রিপোর্টের প্রস্তাবগুলোর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। তবে জওহরলাল নেহেরু এ রিপোর্টে পূর্ণ স্বরাজের

বদলে ডোমিনিয়ন মর্যাদা মেনে নেয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন এবং কংগ্রেস সচিবের পদ থেকে ইস্তফা দেন।

কিছু শিখ নেতৃবৃন্দ রিপোর্টে প্রস্তাবিত সাম্প্রদায়িক ধারাগুলো গ্রহণে অসম্মত হন। সংখ্যালঘু হিসেবে তাদের বিশেষ অধিকারগুলো স্বীকৃত না হওয়ায় হরিজনেরা অসন্তুষ্ট হয়। নেহেরু রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা এবং বিভিন্ন দলের মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে কলকাতায় যে সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে মুসলিম লীগের পক্ষে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নেহেরু রিপোর্ট সংশোধনের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব আনেন। এগুলো ছিল-

১. কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের জন্য তিন ভাগের এক ভাগ আসন;

২. প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার প্রবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ;

৩. প্রদেশগুলোর জন্য রেসিডুয়ারি ক্ষমতা;

৪. বোম্বে থেকে সিন্ধুর পৃথকীকরণ।

কিন্তু হিন্দু মহাসভা এসব দাবি মানতে কোনভাবেই রাজী ছিল না। কংগ্রেসও জিন্নাহ্‌র প্রস্তাবগুলোর বিরোধিতা করে। কোনো সমঝোতা না হওয়ায় মুসলিম লীগ নেহেরু রিপোর্ট গ্রহণ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। লীগ নেতৃবৃন্দ এ রিপোর্টকে তাদের স্বার্থের পরিপন্থী বিবেচনা করে একে প্রত্যাখ্যান করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ নেহেরু রিপোর্টের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে একটি রচনা লিখুন।

সারাংশ

ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে নেহেরু রিপোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমানদের সমঝোতার লক্ষ্যে এবং ভারত সচিব বার্কেনহেড-এর দেয়া চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষিতে সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির দাবিনামা নেহেরু রিপোর্ট নামে পরিচিত। ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় সম্মিলিত উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এর প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সাইমন কমিশনে প্রতিনিধিত্ব করেছিল শুধু–
- ক) মুসলিম লীগ
- খ) কংগ্রেস
- গ) দেশীয় রাজ্য
- ঘ) ব্রিটিশ

২। নেহেরু রিপোর্টের প্রস্তাব কোনটি?
- ক) যৌথ নির্বাচন নীতি চালু করা
- খ) প্রদেশে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা প্রণয়ন করা
- গ) কেন্দ্রে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা প্রণয়ন করা
- ঘ) ভারতে পূর্ণ স্বরাজ চালু করা

৩। নেহেরু রিপোর্ট প্রণীত হয় কত খ্রিস্টাব্দে?
- ক) ১৯২৭
- খ) ১৯২৮
- গ) ১৯২৯
- ঘ) ১৯৩০

৪। 'সাইমন ফিরে যাও' ধ্বনিটি কেন উঠেছিল?
- ক) মুসলিম লীগের কোন প্রতিনিধি কমিশন ছিল না
- খ) কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধি কমিশনে ছিল না
- গ) ভারতীয় কোন প্রতিনিধি কমিশনে ছিল না

ঘ) কমিশনের রিপোর্ট ভারতীয়দের পছন্দ হয় নি

পাঠ-১০.৭ জিন্নাহর চৌদ্দ দফা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর চৌদ্দ দফা কোন পরিস্থিতিতে উত্থাপিত হয়েছিল তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- চৌদ্দ দফার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- চৌদ্দ দফা দাবির ঐতিহাসিক গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	জিন্নাহ, চৌদ্দ দফা, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন, মুসলিম

বৃটিশ ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতির ইতিহাসে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র চৌদ্দ দফা দাবি একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নেহেরু রিপোর্টে ভারতীয় মুসলমানদের দাবি দাওয়ার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শিত হওয়ায় ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে জিন্নাহ্ মুসলিমলীগের পক্ষ থেকে তাঁর বিখ্যাত ১৪ দফা প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। ভারতের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র রচনার যে প্রয়াস সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে গৃহীত হয়, চৌদ্দ দফা দাবি সে ক্ষেত্রে ছিল আরেকটি সংযোজন।

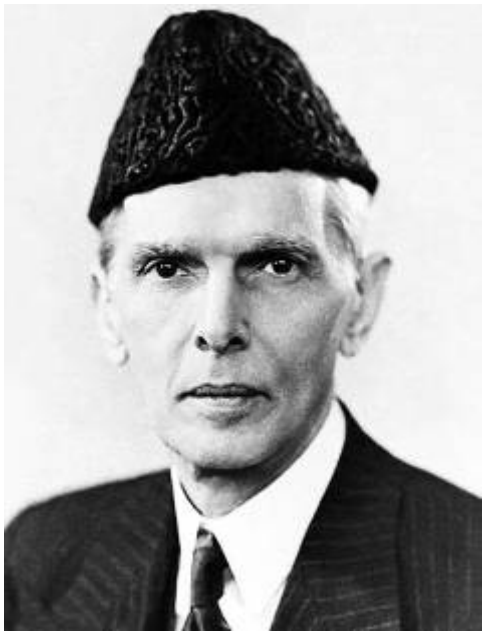

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

আপনারা পূর্ববর্তী পাঠে জেনেছেন রাজকীয় সাইমন কমিশন বয়কটের পাশাপাশি ভারতের রাজনৈতিক দলসমূহের উদ্যোগে শাসনতন্ত্রের রূপরেখা প্রণয়নের জন্য মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। নেহেরু রিপোর্ট নামে উক্ত কমিটির সুপারিশে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন এবং আইনসভায় আসন সংরক্ষণের স্বীকৃতি না থাকায় মুসলিম লীগ সে রিপোর্ট গ্রহণ করতে রাজী হয় নি। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে কলকাতায় সর্বদলীয় কনভেনশনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ লীগের পক্ষ থেকে কিছু সংশোধনী আনেন। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মুসলমানদের জন্য তিন ভাগের এক ভাগ আসন সংরক্ষণ, রেসিড্যুয়ারি বা অনুল্লিখিত ক্ষমতা প্রদেশের হাতে দেয়া ইত্যাদি ছিল এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু হিন্দু মহাসভাসহ অন্যান্যরা জিন্নাহ্‌র প্রস্তাব গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ায় জিন্নাহ্ একে হিন্দু মুসলমানের পথের বিভক্তি বলে আখ্যায়িত করেন। তেজ বাহাদুর সাপ্রু জিন্নাহর প্রস্তাব মেনে নিয়ে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু বহু সদস্য তাতে রাজী না হওয়ায় সর্বদলীয় সম্মেলনে নেহেরু রিপোর্ট সম্পর্কে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হলো না। এ দিকে জিন্নাহ্ শীঘ্রই মুসলমানদের দাবিসমূহ বিন্যস্ত করেন, যা তাঁর চৌদ্দ দফা নামে খ্যাত। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে দিল্লীতে মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে জিন্নাহ্ তাঁর বিখ্যাত চৌদ্দ দফা পেশ করেন। দফাগুলো নিম্নরূপ—

১. ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রের গঠন হবে ফেডারেল পদ্ধতির। রেসিড্যুয়ারি বা অনুল্লিখিত ক্ষমতা থাকবে প্রদেশের হাতে।
২. সব প্রদেশকে একই ধরনের স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।
৩. প্রদেশসমূহের আইন পরিষদে ও অন্যান্য নির্বাচিত সংস্থায় সংখ্যালঘুদের যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। তবে সে প্রতিনিধিত্বের কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠরা যাতে সংখ্যালঘুতে পরিণত না হয় সে দিকে নজর দিতে হবে।
৪. কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব মোট সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের কম হবে না।
৫. বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। তবে কোন সম্প্রদায় ইচ্ছা করলে পৃথক নির্বাচনের বদলে যেকোনো সময় যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারবে।

৬. ভূখণ্ডগত কোনো পুনর্গঠন দ্বারা পাঞ্জাব, বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা ক্ষুণ্ন করা যাবে না।
৭. সকল সম্প্রদায়ের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও শিক্ষার অধিকার দিতে হবে।
৮. কোনো সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সম্মতি ছাড়া কোনো আইন পরিষদ বা নির্বাচিত সংস্থায় উক্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো আইন বা প্রস্তাব অথবা সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে না।
৯. সিন্ধুকে বোম্বে প্রেসিডেন্সি থেকে পৃথক করতে হবে।
১০. ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শাসন সংস্কার প্রবর্তন করতে হবে।
১১. সমস্ত রাষ্ট্রীয় ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের চাকুরীতে যোগ্যতা অনুসারে অন্যান্য ভারতীয়দের ন্যায় পর্যাপ্ত হারে মুসলমানদের নিয়োগ করতে হবে।
১২. মুসলমানদের সংস্কৃতি, ভাষা, শিক্ষা, ধর্ম, ব্যক্তিগত আইন ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইন শাসনতন্ত্রে থাকতে হবে।
১৩. কমপক্ষে সংখ্যানুপাতিক এক তৃতীয়াংশ মুসলমান মন্ত্রী ছাড়া কেন্দ্র বা কোনো প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন করা যাবে না।
১৪. ভারত ফেডারেশনে অন্তর্ভুক্ত সব রাজ্যের সম্মতিছাড়া কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক শাসনতন্ত্রে কোনো পরিবর্তন আনা যাবে না।

চৌদ্দ দফার গুরুত্ব

হিন্দু মুসলমানের মিলনের চেষ্টা করে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে সফল হতে না পেরে শেষ পর্যন্ত উপরিউক্ত চৌদ্দ দফা দাবিনামা তৈরি করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর এ দাবিগুলো ছিল নেহেরু রিপোর্টের প্রতিবাদস্বরূপ। এগুলো বিশ্লেষণ করলে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের লক্ষ্ণৌচুক্তির মাধ্যমে মুসলমানদের রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া ও আশা-আকাংখা বাস্তবায়নের যে শর্তাদি প্রদত্ত হয়েছিল তার প্রতি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও তাদের মিত্রদের অশ্রদ্ধা ও অনীহা ভারতের মুসলমানদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের নেহেরু রিপোর্ট ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের চেয়ে অনৈক্যই সৃষ্টি করে অধিক। তবে এতে মুসলমানদের একটা লাভ হয়েছে যে, ইতিপূর্বে বিভক্ত মুসলিম উপদলসমূহ এখন থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে রাজনীতিতে অংশ নেয়। তাছাড়া পরবর্তীকালে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ মূলত জিন্নাহ্‌র চৌদ্দ দফার উপর ভিত্তি করেই প্রণীত হয়েছিল ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে। কাজেই চৌদ্দ দফা দাবির গুরুত্ব ছিল অনস্বীকার্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	চৌদ্দ দফা জিন্নাহ কেন প্রণয়ন করেছিলেন তার পটভূমি ব্যাখ্যা করে শিক্ষার্থীগণ একটি রচনা লিখবেন।

সারাংশ

জিন্নাহর চৌদ্দ দফা ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ভারতীয়দের পক্ষ থেকে সংবিধানের যে খসড়া প্রণীত হয়েছিল ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে, এটি নেহেরু রিপোর্ট নামে খ্যাত। শাসনতন্ত্রে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব সংরক্ষণ ও পৃথক নির্বাচনের দাবির মতো বিষয় নিয়ে যে অনৈক্য সৃষ্টি হয় এর ফলে হিন্দু মুসলমানদের রাজনৈতিক পথ আলাদা হবার উপক্রম হয়। জিন্নাহ্ মুসলিম লীগের পক্ষে মুসলমানদের দাবিগুলো বিন্যস্ত করেছেন চৌদ্দ দফা নামে। উক্ত দফাগুলোতে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন দাবি সন্নিবেশিত হয়। কিন্তু এর একটা বড় ফল ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিন্ন পথে মোড় নেয়া। শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক চেতনার ফলে ভারত বিভক্তি ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মুসলিম লীগের কোন কাউন্সিল অধিবেশনে জিন্নাহ চৌদ্দ দফা প্রস্তাব পেশ করেন?

ক) দিল্লী খ) পাঞ্জাব
গ) সিন্ধু ঘ) বোম্বে

২। বোম্বে থেকে সিন্ধুর পৃথকীকরণ কে চেয়েছিলেন?

ক) তেজ বাহাদুর সাপ্রু খ) মতিলাল নেহেরু

গ) মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঘ) জওহরলাল নেহেরু

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সমস্যা শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রোউইলসন ১৪ দফা প্রস্তাব পেশ করেন।

৩। ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে উক্ত সংখ্যক দফা পেশ করেন–

ক) মতিলাল নেহেরু খ) মহাত্মা গান্ধী

গ) জওহরলাল নেহেরু ঘ) মুহম্মদ আলী জিন্নাহ

৪। উক্ত নেতা কত খ্রিস্টাব্দে দফাগুলো পেশ করে–

ক) ১৯২৭ খ) ১৯২৮

গ) ১৯২৯ ঘ) ১৯৩০

পাঠ-১০.৮ গোল টেবিল বৈঠক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৩০-৩২ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে আহূত গোল টেবিল বৈঠকের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যা আলোচিত হয়েছে সে সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- গোল টেবিল বৈঠকের ফলাফল মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	গোল টেবিল, গান্ধী- আর.উইন চুক্তি, পৃথক নির্বাচন, সংখ্যালঘু

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতে 'আইন অমান্য আন্দোলন' চলছিল। সে বছরের মে মাসে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দল এ রিপোর্টের সুপারিশ গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। সে অবস্থায় বৃটিশ সরকার লন্ডনে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে এক গোল টেবিল বৈঠক আহবান করেন। উদ্দেশ্য ভারতে বিরাজমান পরিস্থিতি ও সংকটের নিরসনকল্পে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ এবং ভারতের ভবিষ্যত সংবিধানের রূপরেখা প্রণয়ন করা। আহূত বৈঠক তিনটি অধিবেশনে সমাপ্ত হয়।

প্রথম গোলটেবিল বৈঠক

গোল টেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১২ নভেম্বর। অধিবেশনে বৃটেনের রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে ১৬, ভারতীয় রাজন্যবর্গের পক্ষে ১৩ এবং বৃটিশ শাসিত ভারত থেকে ৫৭ জন সহ সর্বমোট ৮৯ জন সদস্য যোগ দেন। কংগ্রেস এ অধিবেশনে যোগ দেয় নি। উপস্থিত ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা ড. আম্বেদকার, মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ এবং তেজ বাহাদুর সাপ্রু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে মেকডোনাল্ড এ বৈঠকে কতগুলো সংবিধানিক প্রস্তাব দেন; তার মধ্যে ১. ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠন, ২. প্রদেশগুলোতে দায়িত্বশীল সরকার এবং ৩. কেন্দ্রে আংশিক দায়িত্বশীল সরকার গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলো অন্যতম।

ভারতের রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিরা মোটামুটিভাবে প্রস্তাবগুলো মেনে নেন। কিন্তু মুসলিম প্রতিনিধিরা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের দাবি করেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলমান সম্প্রদায়ের ন্যূনতম দাবি হিসেবে তাঁর চৌদ্দ দফা দাবির পুনরুল্লেখ করেন। তপসিলী সম্প্রদায়ের তরফ থেকে ডক্টর আম্বেদকারও পৃথক নির্বাচনের দাবি করেন। হিন্দু প্রতিনিধিরা

যৌথ নির্বাচনের পক্ষে ছিলেন, যদিও তাঁরা সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষন নীতি সমর্থন করেন। যা হোক, সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে মতদ্বৈততার কারণে কংগ্রেস এ বৈঠক বর্জন করায় গোল টেবিল বৈঠক মুলতবি হয়ে যায়।

দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক

গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। কংগ্রেসের একক প্রতিনিধিরূপে এম. কে গান্ধী এ বৈঠকে যোগদান করেন। ফেডারেল ব্যবস্থা ও সংখ্যলঘু প্রশ্ন-এ দুটি ছিল বৈঠকের প্রধান আলোচ্য বিষয়। শুরুতে গান্ধী কংগ্রেসকে ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিত্বের একমাত্র দাবিদার বললে উপস্থিত অন্যান্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সম্মিলিতভাবে এর কড়া প্রতিবাদ জানান। মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তীকালীন মেয়াদে কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তনের ব্যাপারে এর পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল থাকে। কিন্তু গান্ধী এতে রাজী ছিলেন না। তিনি বরং অবিলম্বে কেন্দ্রে ও প্রদেশে একই সঙ্গে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতারও তিনি বিরোধিতা করেন। কিন্তু সংখ্যলঘুদের প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দেয়। ফলে গান্ধীর প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। প্রধানত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের প্রভাব হ্রাস করার উদ্দেশ্যেই মুসলমান, শিখ, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ আসন সংরক্ষণের দাবি জানায়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এক যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে পৃথক নির্বাচন প্রথা বহাল রাখার আবেদন করেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় নি। গান্ধী শত চেষ্টা করেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের স্বমতে আনতে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রি মেকডোনাল্ড ঘোষণা করেন যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান না হলে সংবিধান রচনা করা সম্ভব নয়। ভারতবাসী এ বিষয়ে একমত হলেই তবে বৃটিশ সরকারের কিছু করণীয় আছে। এভাবে কোনো সমস্যারই সঠিক সমাধান দিতে পারে নি গোল টেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশন। ফেডারেল পদ্ধতি, সম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের বিষয়, কেন্দ্র-প্রদেশ সম্পর্ক এ সব সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়নি। এসব সমস্যা সামনে রেখেই ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর গোল টেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশন শেষ হয়।

তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক

গোল টেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশন বসে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর। ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত তা স্থায়ী হয়। আগের দুটি অধিবেশনের তুলনায় অনেক কম প্রতিনিধি এতে অংশ গ্রহণ করেন। কংগ্রেসও এ অধিবেশনে প্রতিনিধি পাঠায় নি। তিনটি বিষয় এ সম্মেলনে গুরুত্ব লাভ করে, যথা- ১. কি কি শর্তের ভিত্তিতে রাজ্যগুলো ফেডারেশনে যোগ দেবে, ২. অবশিষ্ট ক্ষমতার বণ্টন এবং ৩. বৃটিশ শাসনের গ্যারান্টি। প্রতিনিধিবর্গের অনেক দাবি বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। যা হোক, ভারতে তখনও আইন অমান্য আন্দোলন চলছিল। ভারতীয় জনগণের উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্যে বৃটিশ সরকার গোল টেবিল আলোচনার ফলাফল একটি শ্বেতপত্র আকারে প্রকাশ করে। যদিও এসব প্রচেষ্টায় শাসনতান্ত্রিক সমস্যার কোনো সমাধান সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় নি।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ ঐতিহাসিক গোল টেবিলের আলোকে নিজেদের মধ্যে উক্ত বিষয়ে একটি গোল টেবিল আলোচনা করবেন।

সারাংশ

নেহেরু রিপোর্টের সুপারিশ মুসলিম লীগ গ্রহণ করে নি। অন্যদিকে সাইমন কমিশনের রিপোর্টও ভারতীয় নেতৃবৃন্দ অগ্রাহ্য করেন। এর ফলে শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে আলোচনার জন্য বৃটিশ সরকার ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে লন্ডনে এক গোল টেবিল বৈঠকে আহ্বান করেন। প্রথম বৈঠকে জাতীয় কংগ্রেস অনুপস্থিত থাকে। দ্বিতীয় বৈঠকে কংগ্রেসের পক্ষে এম. কে গান্ধী যোগদান করেন। কিন্তু আইন সভায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব সংরক্ষণ ও পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থার দাবি কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত না হওয়ায় গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়ে যায়। তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেস না থাকায় শেষ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত বা চুক্তি কিছুই অর্জন সম্ভব হয় নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ব্রিটিশ শাসনামলে প্রথম গোল টেবিল বৈঠক কত খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়?
ক) ১৯২৯ খ) ১৯৩০ গ) ১৯৩১ ঘ) ১৯৩২

২। ব্রিটিশ শাসনামলে প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে প্রদত্ত সাংবিধানিক প্রস্তাব কী?
i. যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন
ii. প্রদেশে দায়িত্বশীল সরকার
iii. কেন্দ্রে আংশিক দায়িত্বশীল সরকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
একটি অঞ্চলের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের লক্ষ্যে বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর দেশে পরপর কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত কোনো শাসনতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত না হওয়ায় উক্ত বৈঠক ব্যর্থ হয়।

৩। বর্ণিত বৈঠকটির নাম কী?
i. প্রথম গোল টেবিল বৈঠক
ii. দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক
iii. তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। উক্ত বৈঠকে অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন কে?
ক) ড. আম্বেদকার খ) তেজ বাহাদুর সাপ্রু গ) মহাত্মা গান্ধী ঘ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

পাঠ-১০.৯ সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ (১৯৩২ খ্রি.)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ কেন ঘোষিত হয়েছিল, বর্ণনা করতে পারবেন।
- সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারবেন।
- সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্পর্কে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ, মুসলমান, শিখ, হরিজন

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের কার্যকারিতা নিরূপণ এবং শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের ক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ সরকার সাইমন কমিশন নিয়োগ করে। কিন্তু ভারতের সব রাজনৈতিক দল একে বয়কট করায় কমিশনের রিপোর্ট গ্রহণ করতেও তারা অস্বীকার করে। বৃটিশ সরকার এ সময়ে

ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার জন্য লন্ডনে এক গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে গোল টেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের দাবির ক্ষেত্রে সমঝোতার অভাবে এবং কংগ্রেস এ অধিবেশনে যোগ না দেয়ায় উক্ত অধিবেশন ব্যর্থ হয়। পরের বছর অনুষ্ঠিত গোল টেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনের শেষ দিকে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড অতি স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করেন যে, ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজেরা নিজেদের গ্রহণযোগ্য ফর্মূলা বের করতে না পারলে বৃটিশ সরকার এককভাবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে বাধ্য হবেন। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকেও সংখ্যালঘু সমস্যা সম্পর্কে ভারতীয় নেতাদের মধ্যে কোনো মতৈক্য হয় নি। ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর উপর চাপ প্রয়োগ করেন এ সমস্যার সমাধানের জন্যে। তিনি উদ্ভুত পরিস্থিতিতে স্বীয় উদ্যোগে এ রোয়েদাদ ঘোষণা করেন। এটাই 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' বা 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' নামে অভিহিত। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট এ রোয়েদাদ ঘোষণা করা হয়।

সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে নিম্নের সিদ্ধান্তসমূহ আরোপ করে:

১. প্রদেশগুলোর আইন সভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আসন বণ্টন করা হয়।
২. রোয়েদাদে মুসলমান, শিখ, ভারতীয় খ্রিস্টান, এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ও নারী সম্প্রদায়ের দাবি মেনে নিয়ে পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ এসব সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসনে কেবল সে সম্প্রদায়ের লোকরাই ভোট দেবে। এরা একই সঙ্গে আবার সাধারণ নির্বাচনী এলাকায়ও ভোট দিতে পারবে।
৩. শ্রমিক ও বণিক সংগঠন, জমিদার এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও নির্দিষ্ট আসন এবং পৃথক নির্বাচনী এলাকা প্রদান করা হয়।
৪. সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে হরিজনদের সংখ্যালঘু হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং এসব অনুন্নত শ্রেণির হিন্দুদের জন্য পৃথক আসন নির্ধারিত হয়। তাদেরকে একাধারে পৃথক নির্বাচনী এলাকা এবং সাধারণ নির্বাচনী এলাকায় ভোট দানের সুযোগ দেয়া হয়।
৫. হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে মুসলমানদের বিশেষ সুবিধা দান করে এ রোয়েদাদ।
৬. পাঞ্জাবে শিখ ও বাংলা প্রদেশে ইউরোপিয়ানদেরকে তাদের জনসংখ্যার হারের চেয়ে অধিক আসন বরাদ্দ করা হয়।
৭. বোম্বে প্রদেশে মারাঠীদের জন্য সংরক্ষিত হয় ৭টি আসন। এছাড়া নারীদেরকেও সম্প্রদায়গত ভিত্তিতে আসন প্রদান করা হয়।
৮. নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারনের সুবিধার্থে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে দেয়া আসনের সামান্য রদবদল হতে পারে বলে রোয়েদাদে ঘোষণা করা হয়।

সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক দল তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। হরিজন সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র নির্বাচনের সুবিধা দেয়ায় হিন্দুদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। শিখ সম্প্রদায়ও এর বিরোধিতা করে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রোয়েদাদের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা করা হয়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন যে, মুসলমানরা অনেক প্রদেশে সংখ্যা লঘু হওয়া সত্ত্বেও জনসংখ্যার তুলনায় তাদেরকে বেশি আসন দেয়া হয়েছে। আবার পাঞ্জাব প্রদেশে শিখদের জনসংখ্যার তুলনায় অধিক প্রতিনিধিত্ব দেয়ায় সেখানে হিন্দুদের আসন কমে যায়।

হরিজনদের পৃথক নির্বাচন প্রদানের মাধ্যমে হিন্দু সম্প্রদায়কে বিভক্ত করার প্রতিবাদে গান্ধী পুনা কারাগারে আমরন অনশন শুরু করেন। তাঁর অনশন ধর্মঘট ভারতের সর্বত্র গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত গান্ধীর জীবন বাঁচাবার উদ্দেশ্যে হরিজন সম্প্রদায়ের নেতা ড: আম্বেদকারসহ অন্যারা তাদের জন্য পৃথক নির্বাচনের সুবিধা ত্যাগ করতে রাজী হন। তাঁরা পুনাতে গান্ধীর সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এটাই পুনা চুক্তি নামে পরিচিত। এ চুক্তির মাধ্যমে স্থির হয় যে, হরিজনদের জন্য কিছুসংখ্যক আসন নির্দিষ্ট থাকবে। তবে তারা সাধারণ হিন্দুদের ভোটে নির্বাচিত হবেন। কংগ্রেস ও অন্যান্য হিন্দু নেতৃবৃন্দ সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে হরিজনদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থাকে 'জাতির রাজনৈতিক সংহতি বিনাসের চক্রান্ত' বলে আখ্যায়িত করেন।

এ দিকে মুসলিম লীগ ও সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারে নি। কারণ তাতে মুসলমানদের আসন সংরক্ষণ সম্পর্কিত দাবি পরিপূর্ণভাবে মানা হয় নি। তাছাড়া কেন্দ্রীয় আইনসভার ব্যাপারেও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবে কিছুই উল্লেখ ছিল না। পাঞ্জাব প্রদেশের ব্যাপারে মুসলমানদের আপত্তি ছিল সবচেয়ে বেশি। তবু তারা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ মেনে নেয়। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগের অধিবেশনে বলা হয় যে, যদিও এ সিদ্ধান্ত মুসলিম দাবির তুলনায় অপ্রতুল, তবুও দেশের বৃহত্তর স্বার্থে মুসলমানরা এটা মেনে নিচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের উপর একটি রচনা লিখবেন

সারাংশ

সাইমন কমিশনের রিপোর্ট কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ প্রত্যাখ্যান করে। এরপর বৃটিশ সরকার ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে লন্ডনে এক গোলটেবিল বৈঠকে আহবান করেন। দুটি গোল টেবিল বৈঠক শেষেও আইন সভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আসন সংরক্ষণের দাবির বিষয়ে কোন ঐক্যমত হয়নি। তখন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড এ বিষয়ে সমস্যার সমাধানকল্পে স্বীয় উদ্যেগে এক 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' ঘোষণা করেন। সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য কিছু আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থাসহ পৃথক নির্বাচনের সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও দলের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়। মুসলমানরা অবশ্য প্রতিবাদ সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। পুনা চুক্তি কিসের প্রভাবে স্বাক্ষরিত হয়েছিল?
   i. নারীদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন
   ii. মোহন দাস করম চাদ গান্ধীর আমরন অনশন
   iii. সাম্প্রাদায়িক রোয়েদাদ
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক) i ও ii খ) i ও iii
   গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে ঘোষিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে?
   ক) ১৯২৯ খ) ১৯৩০
   গ) ১৯৩১ ঘ) ১৯৩২

৩। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে কাদেরকে সংখ্যালঘু ঘোষণা করে সংরক্ষিত আসন দেয়া হয়?
   ক) মুসলমান খ) শিখ
   গ) ভারতীয় খ্রিস্টান ঘ) হরিজন

৪। বোম্বে প্রদেশে মারাঠীদের জন্য সংরক্ষিত আসন কতটি ছিল?
   ক) ৫ খ) ৬
   গ) ৭ ঘ) ৮

পাঠ-১০.১০ ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন যে পটভূমিতে তৈরি হয়েছে তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- এ আইন সম্পর্কে বিভিন্ন দলের প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	ভারত শাসন আইন, দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনটি ছিল একটি সুবৃহৎ দলিল। ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভক্তির সময়ও এ আইন কার্যকরী ছিল। স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের নিজস্ব সংবিধান তৈরি না হওয়া পর্যন্ত এ আইন সংশোধিত আকারে বলবৎ থাকে।

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে গঠিত সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলো একে প্রত্যাখ্যান করে। আপনারা পূর্ববর্তী পাঠে জেনেছেন বৃটিশ সরকার সংবিধান বিষয়ে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মতামত জানার জন্য লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেছিল। তিনটি গোল টেবিল বৈঠকে আলোচনা করেও শাসনতান্ত্রিক সমস্যার কোনো সমাধান হয় নি। ইতোমধ্যে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড আইন সভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে স্বীয় সিদ্ধান্তে এক সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা করেন। কংগ্রেসসহ বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায় এর তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে। তিনটি গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনা সম্বলিত একটি শ্বেতপত্র বৃটিশ সরকার প্রকাশ করে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট এবং উক্ত শ্বেতপত্রের আলোকে পরের বছর ভারতের জন্য একটা নতুন সংবিধানের খসড়া প্রকাশিত হয়। এ খসড়ার ভিত্তিতেই ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেন্টের উভয় হাউসে ভারতের শাসনকার্যের জন্য একটা নতুন শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়। এটাই ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের বিখ্যাত ভারত শাসন আইন।

ভারত শাসন আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

ভারত শাসনে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতি এবং প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন ছিল ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ আইনে স্থির হয় যে, বৃটিশ ভারতের প্রদেশসমূহ ও দেশীয় রাজ্যগুলোকে নিয়ে একটা যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনভার গভর্নর জেনারেল ও তাঁর মন্ত্রীসভার হাতে ন্যস্ত থাকবে। মন্ত্রীগণ আইন সভার মধ্য থেকে গভর্নর জেনারেল কর্তৃক নিয়োজিত হবেন এবং তাঁরা আইন সভার নিকট দায়ী থাকবেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনকার্য সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত-এ দুভাগে বিভক্ত হবে। সংরক্ষিত বিষয়গুলোর যেমন দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, ধর্ম ও উপজাতি সম্পর্কীয় বিষয় ইত্যাদি পরিচালনার দায়িত্ব গভর্নর জেনারেল ও তিনজন উপদেষ্টার হাতে ন্যস্ত থাকবে। হস্তান্তরিত বিষয়গুলো যথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন-শৃংখলা ইত্যাদি গভর্নর জেনারেল কর্তৃক মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত হবে। ক্ষমতার এ বণ্টন দ্বারা কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন প্রবর্তনের পরিকল্পনা করা হয়। এ আইনে গভর্নর জেনারেলকে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাও দেয়া হয়। তিনি ইচ্ছা করলে আইন সভার পরামর্শ না নিয়েই মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিতে পারবেন। যুক্তরাষ্ট্রে দেশীয় রাজ্যগুলোর যোগদান স্বেচ্ছামূলক করা হয়। আইনে এটাও বলা হয় যে ফেডারেল আইনসভার উচ্চ পরিষদের মোট আসন সংখ্যার অর্ধেক দেশীয় রাজ্যগুলো দ্বারা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে না।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের আইনে কেন্দ্রে একটা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠনের ব্যবস্থা ছিল। উচ্চ কক্ষটি রাষ্ট্রসভা এবং নিম্নকক্ষ ফেডারেল পরিষদ নামে অভিহিত হবে স্থির হয়। মোট এগারটি গভর্নর শাসিত প্রদেশের মধ্যে ছয়টিতে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা এবং অবশিষ্ট পাঁচটিতে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তিত হয়। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ অনুযায়ী কেন্দ্রের ন্যায় বিভিন্ন প্রদেশেও মুসলিম ও অনুন্নত শ্রেণির জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা হয়।

এ আইনে প্রদেশগুলোতে দ্বৈত শাসনের পরিবর্তে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করা হয়। নতুন আইন অনুযায়ী প্রদেশের শাসন ব্যবস্থার প্রধান হবেন একজন গভর্নর। জনগণের নির্বাচনে গঠিত হবে একটি আইন সভা। ঐ আইন সভার সদস্যদের মধ্য থেকে গভর্নরকে পরামর্শ দান ও সাহায্যের জন্য একটি মন্ত্রীসভা গঠিত হবে। আইন-শৃংখলা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গভর্নরের এখতিয়ারে থাকবে। মন্ত্রীগণ তাদের কাজের জন্য দায়ী থাকবেন প্রাদেশিক আইন সভার নিকট। গভর্নরকে বিশেষ ক্ষমতাও দেয়া হয়। সে ক্ষমতা বলে তিনি ইচ্ছা করলে আইনসভা ও মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিতে পারবেন। তাছাড়া যেকোন অর্ডিন্যান্স বা জরুরী আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও তাঁর ছিল।

ভারত সচিবের কাউন্সিল এ আইনের বলে বিলুপ্ত হয়। বার্মাকে ভারত থেকে আলাদা করা হয়। সিন্ধু ও উড়িষ্যা নামে দুটি নতুন প্রদেশ গঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিপূরকরূপে এ আইনে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা নেয়া হয়।

ভারতশাসন আইনের প্রতিক্রিয়া

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন দ্বারা সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তা কার্যকর করা হয় নি। ভারতে কোন রাজনৈতিক দল এ আইনে সন্তুষ্ট হতে পারে নি। কংগ্রেস এ আইনের তীব্র নিন্দা করে। জওহরলাল একে 'দাসত্বের এক নতুন অধ্যায়' বলে অভিহিত করেন। কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ অভিযোগ করেন যে, এ আইনে স্বায়ত্ত শাসনের স্বাভাবিক অগ্রগতির কোনো লক্ষণ নেই। হিন্দু মহাসভাও এ আইন সমর্থন করে নি। মুসলিম লীগ নেতা

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এ আইনে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সমালোচনা করেন। তবে তিনি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিধানগুলো সমর্থন করেন। অবশ্য সে আইনে প্রাদেশিক গভর্নরকে এত ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল যে এর ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে প্রকৃত দায়িত্বশীল বলা যায় না।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসনের উপর একটি রচনা লিখবেন

সারাংশ

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন এ দেশের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতি এবং প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের প্রয়াস এ আইনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্ভব হয় নি। অবশ্য প্রদেশ সমূহে এক ধরনের স্বায়ত্তশাসন চালু হয়। কিন্তু প্রদেশের প্রধান নির্বাহীকর্তা গভর্নরের হাতে কতগুলো বিশেষ ক্ষমতা থাকায় সে ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার বলা যায় না। তথাপি ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের আইন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল–
   i. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার
   ii. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
   iii. কেন্দ্রে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে কতটি নতুন প্রদেশ গঠিত হয়?
   ক) ১ খ) ২ গ) ৩ ঘ) ৪

৩। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে কতটি প্রদেশে এককক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা প্রবর্তিত হয়?
   ক) ৫ খ) ৬ গ) ১০ ঘ) ১১

৪। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে কোন অঞ্চলকে ভারত থেকে বাদ দেয়া হয়?
   ক) সিন্ধু খ) পাঞ্জাব গ) বার্মা ঘ) দেশীয় রাজ্য

পাঠ-১০.১১ লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০ খ্রি.)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- লাহোর প্রস্তাবের মূল বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- লাহোর প্রস্তাবের প্রতি কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া এবং এ প্রস্তাবের ফলাফল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	লাহোর প্রস্তাব, চৌধুরী রহমত আলী, শেরে বাংলা, জিন্নাহ

উপমহাদেশের মসুলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি উঠে। লাহোর প্রস্তাবের মধ্যদিয়েই এই দাবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ প্রস্তাবের ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি

ঔপনিবেশিক ভারতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে ভোট দিয়ে নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচন করার অধিকারের দাবি মুসলমানদের বহুদিনের। লক্ষ্ণৌচুক্তিতে কংগ্রেস মুসলমান সম্প্রদায়ের এ অধিকার মেনে নিলেও পরে আবার অস্বীকার করে। বহুদিন পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু মুসলিম বিরোধের ক্ষেত্রে এটা ছিল একটা জটিল বিষয়। এ কারণে শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের কতগুলো উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের অধীনে প্রস্তাবিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে কার্যকর করা হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক নির্বাচনে অধিকাংশ প্রদেশেই কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। তাছাড়া মুসলিম লীগের সাথে কোনো প্রকার আলাপ-আলোচনা ছাড়াই কংগ্রেস মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে মন্ত্রীসভা গঠন করে। কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এ সময় দাবি করেন যে, ভারতে দুটি শক্তির অস্তিত্ব লক্ষণীয়- একটি সরকার, অপরটি কংগ্রেস। অন্যকোনো দলের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করতে নারাজ। তাঁর এ মন্তব্য মুসলমান নেতাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। জিন্নাহ্ এতদিন পর্যন্ত যিনি রাজনীতিতে হিন্দু মুসলিম মিলনের প্রবক্তা ছিলেন, তিনিও এতে ব্যথিত হন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভায় তিনি হিন্দু ও মুসলমানদেরকে দুটি পৃথক জাতি বলে আখ্যায়িত করেন। বস্তুত ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের লাহোর প্রস্তাবের পূর্বেই অনেক মুসলমান নেতাদের মধ্যে ভারত বিভাগ এবং হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের চিন্তাধারা প্রবল হয়ে উঠে। লীগ সভাপতি জিন্নাহ্ও একে হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নের ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় বলে স্থির করেন।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের লাহোর প্রস্তাবের পেছনে রাজনৈতিক ধারার একটা পটভূমি রয়েছে। এ প্রস্তাবে যে স্বাধীন মুসলিম আবাসভূমির দাবি করা হয়েছে অনুরূপ একটা প্রস্তাব ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে কবি ইকবাল তাঁর একটি ভাষণে উল্লেখ করেন। তিন বছর পর ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম এলাকাগুলোর জন্য 'পাকিস্তান' নামের উদ্ভাবন করেন।

কিন্তু ১৯৩৭-৩৮ সাল পর্যন্ত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ মুসলমানদের জন্য পৃথক কোনো রাষ্ট্রের কথা ভাবেন নি। কংগ্রেস নেতাদের দম্ভোক্তি তাঁকে আহত করে এবং রাজনীতির নতুন কৌশল তিনি অবলম্বন করেন। যদিও কখনও তিনি কোন সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি ছিলেন না। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের পর যেসব প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল, সেখানে তাদের কার্যকলাপ মুসলমানদেরকে যথেষ্টভাবে আহত করে। তারা বুঝেছিল সংখ্যালঘু হিসেবে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা হিন্দুদের শাসনাধীনে কখনো বাস্তব রূপ নেবে না। এ ধরণের পরিস্থিতিতে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে জিন্নাহ্ তাঁর "দ্বি-জাতিতত্ত্ব" ঘোষণা করেন। পরবর্তী বছর লাহোরে মুসলিম লীগের ঘোষণায় এরই প্রতিধ্বনি পুনর্ব্যক্ত হয়েছে।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্। এ অধিবেশনেই বাংলার নেতা ও প্রধানমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক বিখ্যাত লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতে বলা হয় যে, কোনো শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা এদেশে কার্যকর বা মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না যদি একটি নিম্নবর্ণিত মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়। যথা-

ক. ভৌগোলিক দিক থেকে সংলগ্ন এলাকাগুলোকে প্রয়োজনীয় রদবদলের মাধ্যমে পৃথক অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে;

খ. ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে এ ধরনের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাসমূহে স্বাধীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠন করতে হবে এবং

শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক

গ. এভাবে গঠিত স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের অঙ্গরাজ্যগুলো থাকবে স্ব-শাসিত ও সার্বভৌম।

লাহোর প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, সর্বক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন স্বার্থ ও অধিকার রক্ষাকল্পে সংবিধানে প্রয়োজনীয় রক্ষা-কবচ রাখতে হবে। প্রকৃত পক্ষে আঞ্চলিক স্বাধিকার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও সার্বভৌমত্ব অর্জনই ছিল লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য।

লাহোর প্রস্তাবের ব্যাখ্যা নিয়ে কিছুটা মতভেদ আছে। কারও কারও মতে লাহোর প্রস্তাবে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছে। একটি উত্তর পশ্চিমে এবং অন্যটি পূর্বে। অন্যমত হলো লাহোর প্রস্তাবে একটি রাষ্ট্রের কথাই বলা হয়েছে, যার ইউনিটগুলো হবে স্ব-শাসিত। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে দিল্লীতে মুসলিম লীগ দলীয় আইন সভার সদস্যদের অধিবেশনে লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করে এক রাষ্ট্রের দাবি রাখা হয়। এর ফলে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাগের সময় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে একটিমাত্র মুসলিম রাষ্ট্র 'পাকিস্তান' গঠিত হয়।

লাহোর প্রস্তাবের প্রতি হিন্দু ও কংগ্রেস নেতাদের প্রতিক্রিয়া ছিল তীব্র। পণ্ডিত নেহেরু এ প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করেন এবং মুসলমানদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আবাসভূমি গঠন অবান্তর বলে আখ্যায়িত করেন। মহাত্মা গান্ধীও তাঁর লেখায় এর সমালোচনা করেন এবং ভারত বিভাগ করাকে পাপের সমতুল্য বলে মন্তব্য করেন। বর্ণ হিন্দুরা এ প্রস্তাব অনুযায়ী ভারত বিভক্তি পছন্দ না করলেও ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ করার দাবি তোলে। এটা অনস্বীকার্য যে, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাবের প্রভাব অপরিসীম।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ লাহোর প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক নিয়ে নিজেদের মধ্যে একটি বিতর্কসভার আয়োজন করবেন।

সারাংশ

'লাহোর প্রস্তাব' ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাসে নি:সন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের মার্চে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে বাংলার নেতা শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতে ভারতের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এ প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা জানান এবং একে অবান্তর দাবি বলে মন্তব্য করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ভারতের স্বাধীন মুসলিম আবাসভূমির দাবিতে সর্বপ্রথম ভাষণ দিয়েছিলেন কে?
ক) কবি ইকবাল খ) চৌধুরী রহমত গ) মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঘ) এ কে ফজলুল হক

২। দ্বিজাতিতত্ত্ব কত খ্রিস্টাব্দে ঘোষিত হয়?
ক) ১৯৩৭ খ) ১৯৩৮ গ) ১৯৩৯ ঘ) ১৯৪০

৩। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন কত খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়?
ক) ১৯৩৫ খ) ১৯৩৭ গ) ১৯৩৮ ঘ) ১৯৩৯

৪। লাহোর প্রস্তাবে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য কোন মুসলিম অঞ্চলকে নির্দেশ করা হয়েছে?
i. পূর্বাঞ্চল
ii. দক্ষিণাঞ্চল
iii. উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

দক্ষিণ এশিয়ার একটি অঞ্চলে প্রধানত দুটি সম্প্রদায়ের বসবাস। বিদেশি শাসনের অধীনে এ অঞ্চলটি স্বাধীনতা লাভের অবস্থায় পৌঁছলে ব্যাপক বিতর্ক শুরু হয়। এমতাবস্থায় একটি সম্প্রদায় আলাদা আবাসভূমি বা আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবি করে বসে। অর্থাৎ দুটি সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র। শেষ পর্যন্ত এ দাবির আলোকেই উক্ত অঞ্চলটি স্বাধীনতা লাভ করে।

ক. 'পাকিস্তান' নামটির উদ্ভাবক কে? ১
খ. 'দ্বি-জাতিতত্ত্ব' ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. বর্ণিত আলাদা আবাসভূমি দাবির সাথে আপনার পাঠ্য বইয়ের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. উক্ত দাবির আলোকে বিদেশি শাসক ও ভারতীয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-১০.১২ মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মন্ত্রীমিশন পরিকল্পনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- মন্ত্রীমিশন পরিকল্পনায় নেওয়া প্রস্তাবসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- মন্ত্রীমিশন পরিকল্পনার প্রস্তাবসমূহ কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা, অন্তবর্তী সরকার, ব্রিটিশ ভারত, দেশীয় রাজ্য

আগের পাঠে আপনারা দেখেছেন লাহোর প্রস্তাব এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এরপর থেকে দ্রুত বেশকিছু ঘটনা ঘটতে থাকে। বোঝা যায় একটা বড় রকমের পরিবর্তন যেন আসন্ন। এসময়ের ইতিহাসেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে মন্ত্রীমিশন পরিকল্পনা বা কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা।

মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা কী?

মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা নেয়ার আগে 'ক্রিপস মিশন' সম্পর্কে একটু জানতে হবে। আপনারা জানেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যান্ড সরাসরি জড়িয়ে পড়েছিল। এ সময় ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় জনসাধারণের সমর্থন পাওয়া জরুরী মনে করে। এই উদ্দেশ্যেই বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিল তাঁর মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে পাঠান। পরামর্শ দেন ভারতবাসীর সাথে যেন একটি শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ ক্রিপস দিল্লীতে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য দলের সাথে আলোচনা করে একটি শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রস্তাব পেশ করেন। ইতিহাসে এই প্রস্তাব 'ক্রিপস মিশন পরিকল্পনা' নামে পরিচিত। এ পরিকল্পনায় যুদ্ধ শেষে ডোমিনিয়ন বা ঔপনিবেশিক স্বায়তশাসন দান, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য একটি গণপরিষদ গঠন ও একটি অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু ক্রিপসের দেয়া প্রস্তাব কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ গ্রহণ করে নি। বরং কংগ্রেস ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে।

ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হওয়ার পর হাল ছেড়ে দেয় নি বৃটিশ সরকার। এবার এগিয়ে আসেন ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল। তিনি ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে সিমলায় একটি বৈঠকে মিলিত হন। কিন্তু এই বৈঠকও ব্যর্থ হয়। অবশেষে সিমলা বৈঠকের সূত্র ধরে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ভারতে আসে। লরেন্স ছাড়া এই প্রতিনিধি দলের অন্য দুই সদস্য ছিলেন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ও এ.ভি. আলেকজান্ডার। এই মিশন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সাথে আলোচনার পর ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ভারতের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করেন। ইতিহাসে একে 'মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা' বলা হয়।

মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবসমূহ

মূলত ভারত উপমাহদেশকে একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করার প্রস্তাব ছিল মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনায়। তিন স্তর বিশিষ্ট ছিল এই যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা। এগুলো হচ্ছে —

ক. প্রস্তাব অনুযায়ী কেন্দ্রে একটি অন্তবর্তী কালীন সরকার গঠন করা হবে

খ. একটি স্বায়ত্তশাসিত ভারত ইউনিয়ন গঠন করা হবে সেখানে অন্তর্ভুক্ত থাকবে ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলো এবং

গ. ভারতীয় প্রদেশগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হবে
'ক' গ্রুপে থাকবে, মাদ্রাজ, বোম্বে, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা, 'খ' গ্রুপে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু এবং 'গ' গ্রুপে থাকবে বাংলা ও আসাম। সিদ্ধান্ত হয় প্রত্যেক গ্রুপের জন্য একটি গণপরিষদ গঠন করা হবে। মন্ত্রী মিশন প্রস্তাব পেশের পাশাপাশি শর্ত জুড়ে দিয়েছিল যে পরিকল্পনার পুরোটিই গ্রহণ করতে হবে- অংশবিশেষ নয়।

ভারতীয় ইউনিয়নের হাতে থাকবে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র, যোগাযোগ এবং মুদ্রা বিভাগের দায়িত্ব। অন্যান্য বিষয়ের দায়িত্ব ন্যাস্ত থাকবে প্রদেশগুলোর হাতে। এছাড়াও বলা হয় কেন্দ্রীয় সংসদে মোট ৩৮৫টি আসনের মধ্যে ৭৮টি মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত করা হয়। পরিকল্পনায় এই সুযোগ রাখা হয় যে, কোনো গ্রুপ ইচ্ছা করলে দশ বছর পর কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে।

মন্ত্রী মিশন প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া

মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা ভারতের বিভিন্ন দলের রাজনীতিকদের মধ্যে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। কারণ এ বিষয়টি সবার সামনে স্পষ্ট হয় যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের নিকট এখন ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চায়। সুতরাং কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয়েই পরিকল্পনার খুঁটিনাটি বিষয় বিশ্লেষণ করতে থাকে। এই পরিকল্পনার ভিতর উভয় দলই নিজেদের মতো করে সুবিধা খুঁজতে থাকেন। এক কেন্দ্রিক সরকার গঠনের প্রস্তাব কংগ্রেসের ভাল লাগে। কারণ এর ভিতর দিয়ে তারা অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেখতে পায়। অন্যদিকে গ্রুপিং ব্যবস্থা উৎসাহ দেয় মুসলিম লীগকে। কারণ এই ব্যবস্থায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি বাস্তবায়ন সম্ভব। একটা নির্দিষ্ট সময় পরে গ্রুপগুলো ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে বলে লীগ নেতারা মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনাকে গ্রহণ করে নেয় যদিও পরবর্তী সময় পুরো পরিকল্পনাকেই প্রত্যাখ্যান করে। অন্য দিকে প্রথম থেকেই কংগ্রেসের অসহযোগিতার ফলে মন্ত্রীমিশন পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার উপর একটি আলোচনা সভার আয়োজন করবেন।

সারাংশ

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারতের অবসান ঘটার কিছু আগে বৃটিশ সরকার কীভাবে এ দেশ ছেড়ে যাবে অথবা কোনো পদ্ধতিতে এদেশবাসীর হাতে ক্ষমতা তুলে দিবে, তা নিয়ে প্রস্তাব ও পরিকল্পনা করতে থাকে। এরই চূড়ান্ত একটি পদক্ষেপ ছিল 'মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা'। এই পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয় যে, ব্রিটিশ সরকার এখন ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে চায়। মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনায় যে প্রস্তাব রাখা হয়, তাতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ই তাদের দলীয় স্বার্থ রক্ষার প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা গ্রহণে সম্মত হলেও কংগ্রেস পরিকল্পনাটি প্রত্যাখ্যান করে। এভাবে ব্যর্থ হয়ে যায় মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে গঠিত মন্ত্রী মিশন এর সদস্য ছিলেন–

i. লর্ড পেথিক লরেন্স
ii. স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস
iii. এ ভি আলেকজান্ডার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনায় কোন অঞ্চলকে 'গ' গ্রুপে রাখা হয়?

ক) আসাম খ) পাঞ্জাব
গ) সিন্ধু ঘ) উরিষ্যা

৩। মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা কত খ্রিস্টাব্দে গৃহীত হয়েছিল?

ক) ১৯৪২ খ) ১৯৪৫
গ) ১৯৪৬ ঘ) ১৯৪৭

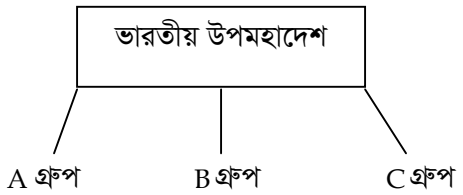

ক. অখণ্ড স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব কারা উপস্থাপন করে? ১
খ. ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. প্রদত্ত চার্টটি আপনার পাঠ্য বইয়ের কোন পরিকল্পনাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. উক্ত পরিকল্পনাটি কী ব্যর্থ হয়েছিল? আপনার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন। ৪

মডেল উত্তর

ক. অখণ্ড স্বাধীন বাংলার প্রস্তাবক হচ্ছেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শরৎ বসু।

খ. ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে একটি সুবৃহৎ দলিল।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন সম্পর্কে কংগ্রেস তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে। মুসলিম লীগ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে কিছুটা নমনীয় হলেও অন্যান্য বিষয়াবলি নিয়ে আপত্তি জানায়।

গ. বর্ণিত চার্টটি বৃটিশ শাসিত ভারতে মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার ইঙ্গিত বহন করে।

ভারতের শাসনতান্ত্রিক জটিলতা নিরসনকল্পে ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হলে সমস্যা আরও বেড়ে যায়। অবশেষে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স এর নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি মিশন প্রেরণ করে। এটিই ইতিহাসে মন্ত্রী মিশন নামে অভিহিত। তাদের প্রণীত পরিকল্পনা হলো মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা।

মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা ভারতীয় উপমহাদেশকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের প্রস্তাব করা হয়। এগুলো হলো–

A গ্রুপ– মাদ্রাজ, বোম্বে, যুক্ত প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উরিষ্যা। এ অঞ্চলগুলো ছিল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ।

B গ্রুপ– উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু। এ অঞ্চলগুলো ছিল মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ।

C গ্রুপ– বাংলা ও আসাম। এ অঞ্চরে হিন্দু ও মুসলমান প্রায় সমান ছিল।

ঘ. মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল।

মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনায় তিন স্তর বিশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার রূপরেখা প্রদান করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী কেন্দ্রে একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হবে। স্বায়ত্তশাসিত ভারত ইউনিয়নের এ অন্তবর্তীকালীন সরকারে ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি থাকবে। এ সরকার বিধিবদ্ধ নিয়মে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। এতে কেন্দ্রীয় ৩৮৫টি আসনের মধ্যে ৭৮টি মুসলমানদের মধ্যে সংরক্ষিত রাখা হয়। প্রণীত তিনটি গ্রুপের যেকোনো গ্রুপ দশ বছর পর ইচ্ছা করলে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগও রাখা হয়।

কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় অখণ্ড ভারতের সম্ভাবনা দেখতে পায়। অপরদিকে গ্রুপিং ব্যবস্থা মুসলিম লীগকে অনুপ্রাণিত করে। কেননা লাহোর প্রস্তাবে মুসলমানদের জন্য আবাসভূমি এবং মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনায় গ্রুপগুলোর জন্য দশ বছরের সীমারেখা মুসলিম লীগের পক্ষে চলে আসে। অর্থাৎ দশ বছর পর তারা কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে যা লাহোর প্রস্তাবেরই বাস্তবায়ন। কিন্তু উভয় দলের জন্য সেটি সমস্যা ছিল তা হলো– পরিকল্পনার পুরোটাই গ্রহণ করতে হবে– অংশ বিশেষ নয়। তাই শেষ পর্যন্ত এ পরিকল্পনা কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কাউকেই খুশি করতে পারে নি।

মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার ব্যাপারে কংগ্রেস প্রথম থেকেই আপত্তি জানিয়েছিল। মুসলিম লীগ প্রথমে অংশ বিশেষ সমর্থন করলেও শেষ পর্যন্ত পুরো পরিকল্পাই প্রত্যাখ্যান করে। অর্থাৎ স্বার্থের বেড়াজালে আবদ্ধ মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা কারোরই যথার্থ স্বার্থ পূরণে অপারগ হয়। তাই শেষ পর্যন্ত এটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

পাঠ-১০.১৩ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারত স্বাধীনতা আইন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- লর্ড মাউন্ট ব্যাটন ও কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- বসু-সোহরাওয়ার্দীর স্বাধীন বাংলা প্রস্তাব কী ছিল তার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ভারত স্বাধীনতা আইনের ফলাফল মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	১৯৪৭ সালের ভারত শাসন আইন, মাউন্ট ব্যাটন, বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব, অখণ্ড স্বাধীন বাংলা

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে এই হস্তান্তর সম্পন্ন করা হয়। এটিই ইতিহাসে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের 'ভারত স্বাধীনতা আইন' নামে পরিচিত।

ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রেক্ষাপট

মন্ত্রীমিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পর ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতা নেমে আসে। এ সময়ের বিশৃঙ্খল অবস্থার ভিতর থেকেই জন্ম নিয়েছিল ভারত স্বাধীনতা আইনটি। কংগ্রেস মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করার জন্যই ব্যর্থ হয়েছিল এই পরিকল্পনা। এই ঘটনা মুসলিম লীগেকে আহত করে। লীগ দাবি করে যেহেতু তারা পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেছে, তাই সরকারের উচিত লীগকে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনে সম্মতি দেওয়া। কিন্তু বিষয়টি একদলীয় হয়ে যাচ্ছে বলে বড়লাট ওয়াভেল লীগের দাবির প্রতি সম্মতি জানাতে পারেন নি। লীগের কাছে সরকারের এই মনোভাব চুক্তি ভঙ্গ বলে মনে হলো। লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সৃষ্টি হলো দূরত্ব।

মুসলিম লীগ এবার নিজের মতো করে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বোম্বাইয়ে একটি সম্মেলন ডাকে। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় পাকিস্তান অর্জনের জন্য মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (ডাইরেক্ট এ্যাকশন) শুরু করবে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট দেশব্যাপী প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনের ডাক দেয়া হয়। মুসলিম লীগ নেতা অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ব্রিটিশ সরকারকে এই বলে সতর্ক করে দেন যে কংগ্রেস যদি ক্ষমতায় বসে তবে বাংলা স্বাধীনতা ঘোষণা করবে এবং পাল্টা সরকার গঠন করবে। তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে কোনো রাজস্ব দেবে না এবং কেন্দ্রের সাথে কোনো সম্পর্কও রাখবে না।

এদিকে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের দিন ঘনিয়ে আসে। বোম্বাই থেকে কোলকাতায় ফিরে আসেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ও মুসলিম লীগের সেক্রেটারি আবুল হাশেম। তাঁরা জনমত গঠন করতে থাকেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের দিন কলকাতায় হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে যায়। দাঙ্গায় হাজার হাজার নিরীহ মানুষ প্রাণ হারায়। দাঙ্গা কলকাতায় শুরু হলেও ক্রমে তা বাংলার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। অবস্থার মারাত্মক অবনতি হতে থাকলে ব্রিটিশ সরকার শেষ রক্ষার চেষ্টা করে। তারা ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার কথা ঘোষণা করে। সুতরাং কিভাবে দেশ বিভক্ত করা হবে এবং ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে তার জন্য একটি নীতি নির্ধারণের প্রয়োজন উপস্থিত হয়। এ উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার লর্ড ওয়াভেল এর পরিবর্তে ভারতের বড়লাট করে পাঠান লর্ড মাউন্ট ব্যাটনকে।

লর্ডমাউন্ট ব্যাটন ও কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী

বড়লাটের ক্ষমতা গ্রহণ করে প্রথম দিল্লীতে আসেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটন। তিনি ঘোষণা দেন ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মধ্যেই বৃটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। মাউন্ট ব্যাটনের সহানুভূতি ছিল কংগ্রেসের প্রতি। কংগ্রেসের সমর্থক হিসেবে তিনি অখণ্ড ভারতের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু এভাবে লীগের সাথে আপোস করা সম্ভব হয় নি। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস লীগের দাবি

মেনে নিয়ে ভারত বিভাগ করতে রাজি হয়। কিন্তু এতে বেশকিছু শর্ত আরোপ করে যা লীগের পক্ষে মানা সম্ভব হয়নি। এরকম ভিন্ন মত ও চিন্তা রাজনৈতিক আকাশকে আবার অন্ধকার করে ফেলে।

বসু-সোহ্‌রাওয়ার্দীর অখণ্ড স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলা প্রস্তাব

কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে রাজনৈতিক মত পার্থক্য যখন তীব্র হচ্ছিল তখনই বাংলার কয়েকজন নেতা অখণ্ড বাংলা গড়ার প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসেন। অখণ্ড বাংলার প্রস্তাব প্রথম উত্থাপন করেন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। বেশ ক'জন প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতাও এ প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। তাঁরা হচ্ছেন- শরৎবসু, কিরণ শংকর রায় প্রমুখ। মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশেমও এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। শরৎবসুর সক্রিয় সমর্থনের কারণে প্রস্তাবটি 'বসু-সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রস্তাব' নামে পরিচিত হয়। বাংলার এই দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ বুঝেছিলেন, কংগ্রেস ও লীগের কাছে দলীয় স্বার্থই বড়। বাংলার স্বার্থের কথা কখনই তারা বিশেষ বিবেচনায় রাখবে না। তাই অখণ্ড বাংলার প্রস্তাব ঘোষণা ও বিশ্লেষণ করেন শরৎবসু ও সোহ্‌রাওয়ার্দী। তাঁদের মতে এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সমুন্নত রাখা সম্ভব। এই প্রস্তাবের ভিতর হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাও নেয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ মহৎ প্রচেষ্টা বাস্তবায়িত হতে পারে নি। এবারও প্রথম বিরোধিতা আসে কংগ্রেসের পক্ষ থেকেই। কংগ্রেসের অবাঙালী ও রক্ষণশীল সদস্যরা প্রচণ্ড বিরোধিতায় মেতে ওঠে। কংগ্রেস এবার অখণ্ড বাংলার বদলে পাকিস্তান দাবিকেই মেনে নেয়। এভাবে ভারত বিভাগের প্রসঙ্গটি স্পষ্ট হয়ে যায়।

ভারত স্বাধীনতা আইনের ফলাফল

ভারত স্বাধীনতা আইনের মধ্যে দিয়ে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ও ১৫ আগস্ট যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারত নামের দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। আপনারা পাঠ-১১ এ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের কথা জেনেছেন। এই ভারত শাসন আইনকেই অনেক পরিবর্তন ও সংস্কার করে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারত স্বাধীনতা আইনে রূপান্তর করা হয়। এ আইনের তিনটি ফলাফল লক্ষ করা যায় —

ক. পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি ভিন্ন ডোমিনিয়ন স্থাপন করা হয় এবং এই ডোমিনিয়ন দুটি ছিল সমান মর্যাদা সম্পন্ন ও স্বায়ত্তশাসিত

খ. পাকিস্তানের মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করা হয়। ডোমিনিয়ন আইন সভায় যে সব আইন গৃহীত হতো তাতে স্বাক্ষর দানের পূর্ণ অধিকার থাকতো গভর্নর জেনারেলের।

গ. ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের আইন অনুযায়ী গঠিত আইনসভা গণপরিষদের মর্যাদা লাভ করে। এই গণপরিষদের উপর দায়িত্ব ছিল দেশের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ অখণ্ড বাংলা প্রস্তাবের উপর একটি নিবন্ধ রচনা করবেন।

সারাংশ

বৃটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ১৫ ও ১৪ আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টো রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ভারত স্বাধীনতা আইন হঠাৎ করেই তৈরি হয় নি। মন্ত্রী মিশনের ব্যর্থতার পর যে অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা বাংলার নেতাদের আতঙ্কিত করে তোলে। তাই বসু-সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে অখণ্ড বাংলার চিন্তা জনপ্রিয় হয়ে উঠে। কিন্তু কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের তীব্র বিরোধিতার মুখে এই প্রচেষ্টা ভেঙ্গে যায় মধ্য দিয়ে। অবশেষে শেষরক্ষা করতে হয় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারত স্বাধীনতা আইন প্রণয়ন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। "কংগ্রেস যদি ক্ষমতায় বসে তা হলে বাংলা স্বাধীনতা ঘোষণা করবে।" উক্তিটি কার?

ক) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী খ) শরৎ বসু

গ) কিরন শংকর রায় ঘ) আবুল হাশেম

২। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারত স্বাধীনতা আইনটি হলো–
ক) ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের সংস্কার
খ) বসু সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাবের সংস্কার
গ) ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের লাহোর প্রস্তাবের সংস্কার
ঘ) মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার সংস্কার

৩। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের ঘোষণা দেয় কারা?
ক) দেশিয় রাজ্যসমূহ খ) কংগ্রেস
গ) মুসলিম লীগ ঘ) হরিজন সম্প্রদায়

সৃজনশীল প্রশ্ন

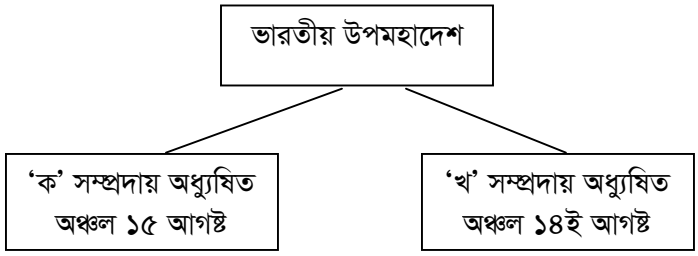

ক. লাহোর প্রস্তাব কে কত খ্রিস্টাব্দে পেশ করেন? ১
খ. জিন্নাহ কেন ১৪ দফা প্রস্তাব পেশ করেন? ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. বর্ণিত অঞ্চল দুটি আপনার পাঠ্য বইয়ের কোন আইনের বাস্তব রূপ? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. উক্ত অঞ্চল দুটির জন্ম যে প্রস্তাবের প্রভাবে সম্পন্ন হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-১০.১৪ পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের অভ্যুদয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- হিন্দু-মুসলিম বিরোধের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ক্ষমতা হস্তান্তর দিবসের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে যেসব প্রস্তাব রাখা হয়েছিল, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্র সৃষ্টির সময়ের ঘটনাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	ভারত, পাকিস্তান, সোহ্‌রাওয়ার্দী, গান্ধী

আপনারা পূর্ববর্তী পাঠে দেখেছেন ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ এবং ১৫ আগস্ট ব্রিটিশ ভারতের অবসান ঘটে, জন্ম নেয় নতুন দুটি রাষ্ট্র — ভারত ও পাকিস্তান। এত বড় একটি ঘটনা হঠাৎ করে ঘটে যেতে পারে না। ভারত বিভাগের প্রেক্ষাপট হিসেবে কিছু ঘটনার কথা আপনারা জেনেছেন। এখন এই দুই রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের সময়কালে তাৎক্ষণিক কিছু ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী

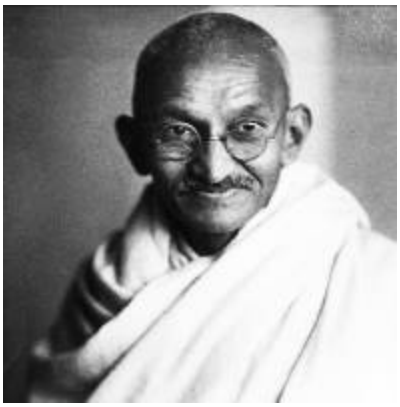

মহাত্মা গান্ধী

হিন্দু-মুসলিম বিরোধের প্রতিক্রিয়া

আগের পাঠে আপনারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা জেনেছেন। দেশ বিভাগের পূর্বে প্রচুর রক্ত ঝরেছিল এ দেশবাসীর। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্টেই প্রচুর দাঙ্গার খবর আসতে থাকে। হতাশ হয়ে পড়েছিল এ দেশবাসী। এ সময়েই হঠাৎ আশার আলো দেখা যায়। নতুন প্রেরণা নিয়ে এগিয়ে আসেন দু'জন ব্যক্তিত্ব। এঁদের একজন এম. কে গান্ধী এবং অপরজন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন সঙ্কটের উৎস। দেশ বিভাগের পর কীভাবে সীমানা নির্ধারণ করা হবে তা নিয়ে বিতর্ক ও অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে রাজনীতিবিদ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যে খবর প্রচারিত হচ্ছিল তাতে উত্তপ্ত হচ্ছিল চারপাশ। হিন্দু মুসলিম উভয়ই নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। ফলে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ বাড়ে। দাঙ্গাও বিস্তার লাভ করতে থাকে। সরকার সে দাঙ্গা থামাতে পারে নি। সে অসাধ্য সাধিত হলো গান্ধীর ব্যক্তিত্বে। দাঙ্গার কথা ভুলে গিয়ে জনতার মধ্য থেকে শ্লোগান উঠতে থাকল 'হিন্দু-মুসলমান এক হও', 'হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই'; এইভাবে শান্তি ও সম্প্রীতির আবহাওয়া ক্রমে বিস্তার লাভ করতে থাকে। দাঙ্গা অধিক জোরদার হচ্ছিল বাংলা এবং পাঞ্জাব প্রদেশে। কারণ দুটি প্রদেশই সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বিভক্ত হচ্ছিল। তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলকাতায় দাঙ্গা দমনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। মহাত্মা গান্ধীও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল সফরে এলে সোহ্‌রাওয়ার্দী তার সঙ্গে দাঙ্গা কবলিত এলাকায় সফর করেন।

ক্ষমতা হস্তান্তর দিবসের অনুষ্ঠান

জুন মাসেই মাউন্ট ব্যাটন সকল দলের নেতাদের সঙ্গে আলাপ করলেন। তাদের আহবান জানালেন যেন মেনে নেয়া হয় দেশ বিভাগের ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের পরিকল্পনা। এ সময়ের নেতা নেহেরু, জিন্নাহ ও সরদার বলদেব সিং, মাউন্ট ব্যাটনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে রেডিওতে বক্তৃতা করেন। স্থির হয় যে ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ১৫ আগস্ট

ভারত স্বাধীন হবে। এ সময়ের প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব লর্ড ইজমে ভাইসরয়কে একটা নোট লিখে পাঠান। শিরোনাম ছিল 'ক্ষমতা হস্তান্তর দিবসের অনুষ্ঠান'। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের সাথে রাজনৈতিক প্রশ্ন জড়িত। তাই নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে বিবেচনায় রাখতে হবে।

ক. ভারত-পাকিস্তান উভয় ডোমিনিয়নের রাজধানীতেই ক্ষমতা হস্তান্তর উপলক্ষে অনুষ্ঠান হওয়া প্রয়োজন। সকালের দিকে দিল্লীতে এবং বিকেলের দিকে করাচীতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে তাতে ভাইসরয়ের যোগদান সম্ভব।

খ. দিল্লীর অনুষ্ঠান খুব জাঁকজমকের সাথে করা উচিত। এ ব্যাপারে উভয় ডোমিনিয়নের প্রধানমন্ত্রীদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে ভাইসরয়ের ইচ্ছার বাইরে যাবে না কোনো সিদ্ধান্ত।

গ. দিল্লীর ক্ষমতা হস্তান্তর অনুষ্ঠান দরবার হলে অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রত্যাশা থাকবে ১৫ আগস্ট মহামান্য ব্রিটিশ সম্রাটের বাণী ভাইসরয় পড়ে শোনাবেন।

ঘ. উভয় ডোমিনিয়নের প্রতিনিধিদের অনুষ্ঠানে যোগদান নিশ্চিত করতে হবে।

ঙ. ক্ষমতা হস্তান্তর দিবসে উভয় ডোমিনিয়ন তাদের নিজস্ব লোক দিয়ে অন্তত একটি ইউনিট গড়ে তুলবে। ব্রিটিশ সৈন্যদেরও এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হবে। উভয় ডোমিনিয়নের রাজধানীতেই সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট মওজুদ থাকবে।

চ. এ ব্যাপারে মতামত চেয়ে লন্ডনে *ইন্ডিয়া অফিসে* একটি চিঠি লিখতে হবে।

প্রতিক্রিয়া

লর্ড ইজমের প্রস্তাবের বেশকিছু প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ প্রশাসন অংশগ্রহণ করুক এটা জিন্নাহ বা নেহেরু কেউ চান নি। তবে ১৪ আগস্ট করাচীর স্বাধীনতা দিবসের প্রথম অনুষ্ঠানে জিন্নাহ্ মাউন্ট ব্যাটনকে যোগ দেয়ার প্রস্তাব করেছিলেন।

ক্ষমতা হস্তান্তর দিবসে মহামান্য বৃটিশ সম্রাটের বাণী পাঠানোর যে প্রস্তাব রাখা হয়েছিল, বৃটেনের শ্রমিক দলের সরকার তার সাথে একমত হতে পারে নি। কারণ, তাদের ধারণা ছিল ভারতীয় জনগণ এটা পছন্দ করবে না।

পাকিস্তান ও ভারতের অভ্যুদয়

পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়কে মহামান্য বৃটিশ সম্রাটের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশ্যে ভাইসরয় ১৩ আগস্ট করাচী পৌঁছেন। বিকেলের আনুষ্ঠানিক ভোজ সভায় জিন্নাহ্ দীর্ঘ ভাষণ পাঠ করেন। ভাইসরয়ও সেখানে তাঁর বক্তব্য দেন।

১৪ আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণে ভাইসরয় পাকিস্তান সৃষ্টিকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেন। এই দিন বিকেলেই দিল্লীতে ফিরে আসেন ভাইসরয়।

স্বাধীনতার আকাঙ্খায় ১৪ আগস্ট সন্ধ্যা থেকেই দিল্লীতে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল। স্বাধীনতার উৎসবে যোগ দেয়ার জন্য হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসতে থাকে দিল্লীর দিকে। ১৫ আগস্ট নেহেরু ভারতীয় বিধান সভার উদ্দেশ্যে এক ভাষণে ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এদিন স্বাধীনতা ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে আনন্দে উদ্বেল হয়ে পড়ে, দিল্লী তথা ভারত। এভাবে উপমহাদেশের ইতিহাসে দু'শো বছরের ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটে, জন্ম নেয় ভারত আর পাকিস্তান নামের দু'টো স্বাধীন রাষ্ট্র।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ বৃটিশ ভারত-ভাগ এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উপর একটি নাটিকা মঞ্চস্থ করবেন।

সারাংশ

বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ও ১৫ আগস্ট যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৪৬ ও ৪৭ খ্রিস্টাব্দের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ভারত বিভাগের প্রশ্নটিকে জরুরী করে তুলেছিল। বৃটিশ সরকার ভারতীয় নেতাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে একটি নীতি নির্ধারণ করেছিলেন। তারই পথ ধরে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার মধ্য থেকে বেড়িয়ে এলো একটি স্লোগান– "হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই।" উক্ত অসাধ্য সাধনে কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?

ক) মহাত্মা গান্ধী খ) লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন
গ) মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঘ) শরৎ বসু

২। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দেয়া হয় কোথায়?

i. করাচী ii. লাহোর iii. দিল্লী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। এদের মধ্যে আজারবাইজান, জর্জিয়া, লিথুনিয়া, এস্তোনিয়া অন্যতম।

৩। বর্ণিত স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ রাষ্ট্র হলো–

i. পাকিস্তান ii. বাংলাদেশ iii. ভারত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। উক্ত রাষ্ট্রসমূহ স্বাধীনতা লাভের কিছু দিন পূর্বে যে সংকটে পড়েছিল, তা হলো–

ক) ভয়াবহ যুদ্ধ খ) ভয়াবহ দাঙ্গা
গ) তীব্র আন্দোলন ঘ) নেতৃত্বের তীব্র কোন্দল

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১ ঃ ১। ক ২। গ ৩।ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.২ ঃ ১। ঘ ২। গ ৩। খ ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৩ ঃ ১। গ ২। গ ৩। ক ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৪ ঃ ১। ঘ ২। খ ৩। গ ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৫ ঃ ১। ক ২। ক ৩। ঘ ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৬ ঃ ১। ঘ ২। খ ৩। খ ৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৭ ঃ ১। ক ২। গ ৩। ঘ ৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৮ ঃ ১। খ ২। ক ৩। ক ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৯ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। ঘ ৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১০ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১১ ঃ ১। ক ২। গ ৩। খ ৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১২ ঃ ১। ঘ ২। ক ৩। গ